গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ২২ - ২৮ জুলাই, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ভারত-মার্কিন সামরিক চুক্তি দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপজ্জনক

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি

২৯ জুন স্বাক্ষরিত ভারত-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পর্কে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১১ জুলাই নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন —

''অতি সম্প্রতি ভারতের পক্ষ থেকে স্বয়ং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১০ বছর মেয়াদী ভারত-মার্কিন সামরিক সমঝোতা, রেখে ঢেকে যার নাম দেওয়া হয়েছে ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সম্পর্কের খসড়া কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক ফর ইউ এস-ইন্ডিয়া ডিফেন্স রিলেশনসিপ), তা প্রকৃতপক্ষে একটি সমঝোতা বা চুক্তিরই সমতুল, যদিও প্রকাশ্যে তা স্বীকার করা হচ্ছে না। চুক্তির বিস্তৃত বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে — 'যৌথ উদ্যোগে সামরিক উৎপাদন', 'সামরিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যের আদানপ্রদান', 'সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে তথ্য বিনিময়', 'দুনিয়ার সর্বত্র শান্তিরক্ষার জন্য যৌথভাবে সেনা প্রেরণ', 'বহুজাতিক সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ' ইত্যাদি। চুক্তির অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বপ্রিয় ভারতের জনগণের কাছে প্রচণ্ড আঘাত হিসাবে এসেছে। ইতিমধ্যেই গ্যাটের ধাক্কায় এবং বিশ্বায়নের বিপুল প্রবাহে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন প্রভাব অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা আধিপত্যে পরিণত হওয়ার বিপজ্জনক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই সামরিক চুক্তি কার্যকর হলে তা দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ও ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে, বিশেষত দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মতো উত্তেজনাপ্রবণ ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে মার্কিন হস্তক্ষেপ বৃদ্ধির সুযোগই করে দেবে মাত্র।

সমগ্র বিশ্বের কাছে আজ একথা পরিষ্কার যে, সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে নীতি নিয়ে চলছে, তার লক্ষ্য হল — বিরুদ্ধ বিশ্বজনমতকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে জমিদারসুলভ ভূমিকা ও আধিপত্যকামী আগ্রাসনের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পদানত করা। এই

দুয়ের পাতায় দেখুন

সাম্যবাদী হতে হলে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ এগুলো সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে। বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের সঙ্গে এই জায়গায় সাম্যবাদী চিন্তাধারার মূল পার্থক্য। যথার্থ সাম্যবাদী সেই হতে পারে যার মানবতাবোধ ব্যক্তিস্বার্থবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত — খাদ হয়ে মিশে নেই, যে নির্দ্বিধায় ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে শিখেছে, যে হাসিমুখে সেসব জলাঞ্জলি দিতে পারে। এটা সকলে পারে না, যে পারে সেই কমিউনিস্ট হওয়ার যোগ্য। বাকিরা কমিউনিস্ট বলে মিথ্যা অহংকার করে মাত্র। — **শিবদাস ঘোষ**

ভাঙন-দুর্গতদের প্রতি সরকারি অবহেলা। বহরমপুরে

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকে বিক্ষোভ

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৬ জুলাই মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে মুরগির ছানা বিতরণের জন্য ; অবশ্য মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা-ভাঙন সমস্যা নিয়ে আলোচনাও তাঁর এজেন্ডায় ছিল। শুধুই আলোচনা? বছরের পর বছর যে মানুষগুলো মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে, সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখিরি হয়েছে, অনাহারে ইতিমধ্যে মারাও গেছে কয়েকজন, তাদের শোচনীয় অবস্থা মুখ্যমন্ত্রী কেন স্বচক্ষে দেখবেন না? তিনি না বলেছিলেন, তাঁর উন্নততর বামফ্রন্টের প্রশাসন হবে সংবেদনশীল! কোথায় তার পরিচয়? এই কথাগুলো স্পষ্টভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কানে তুলতেই সেদিন বহরমপুরে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন এস ইউ সি আই কর্মীরা। ঠিক ওই সময়েই জলঙ্গীর পরাশপুর, টলটলিতে ঘরের পর ঘর তলিয়ে যাচ্ছিল পদ্মার গর্ভে। উদাসীন প্রশাসন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সে-বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল কিনা জানা নেই, তবে কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখানোর মতো বেয়াদপির সাজা দিতে তৎপর হয়ে উঠেছিল তারা।

মুর্শিদাবাদের মানুষের ঘর ভাঙছে শুধু কি ভাঙনেই ? দারিদ্র্য, অনাহার এ জেলার পরিবারগুলোকে এমনভাবে পিষে মারছে যে দু'মুঠো ভাতের লোভ দেখিয়ে নারীপাচারকারীরা প্রায় প্রকাশ্যেই তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সব জেনেও পুলিশ-প্রশাসন নীরব ; একজন অপরাধীও শাস্তি পায়নি। বুদ্ধদেববাবুর 'সংবেদনশীল' প্রশাসনের এ হচ্ছে আরেকটি নমুনা। সরকার এদের জন্য ভাববে, ভাঙন-দুর্গতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে — এটা তো যেকোন সভ্য সমাজের আশা ! দাবিটাও পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। সরকার যথার্থ সংবেদনশীল হলে এ সমস্যার সমাধানে কিছু করতে পারে। অথচ পুলিশ কী করল ? লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গেল মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীদের দিকে। বিক্ষোভকারীদের খোঁজে বহরমপুরে এস ইউ সি আই অফিস ঘিরে ফেলল। কোনও ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশির নামে পার্টি অফিসের মধ্যে ঢুকতেও দ্বিধা করল না তারা। অফিসের দরজা থেকে গ্রেপ্তার করল এম এস এস-এর জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড রোকেয়া বেগমকে। বাসস্ট্যান্ড থেকে তুলে নিয়ে গেল সংগঠনের কর্মী কমরেড শিউলী আহমেদকে।

এস ইউ সি আই অফিস ঘিরে ফেলে পুলিশের তল্লাশি গোটা এলাকার পরিবেশকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। নারীপাচারকারীদের ধরতে যে পুলিশকে বিন্দুমাত্র তৎপর হতে দেখা যায় না, এস ইউ সি আই-এর অফিসে তল্লাশি চালিয়ে গণআন্দোলনের কর্মীদের ধরতে সেই পুলিশেরই এ হেন তৎপরতা মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। বুদ্ধদেববাবুর সংবেদনশীল প্রশাসন তৎপরতার প্রমাণ দিতে বাজার করতে আসা দুইজন মহিলাকেও রাস্তা থেকে গ্রেপ্তার করে তুলে নিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ধিক্কারে ফেটে পড়ে। জেলার সর্বত্র এস ইউ সি আই-এর পথসভা থেকেও প্রতিবাদ ওঠে। এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড পূর্ণিমা কর্মকার ধৃত চারজন মহিলার অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেছেন।

এ'দিন মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে প্রবীণ সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরি ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতা কমলকান্তি ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ভাঙন-দুর্গতদের পুনর্বাসন দাবি করে স্মারকলিপি তুলে দিয়েছেন।

৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে
সমাবেশ
রানি রাসমণি রোড ● বিকাল ৪টা
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সভাপতি ঃ কমরেড মানিক মুখার্জী

১ - ৩ আগস্ট
কোটেশন একজিবিশন
মহাবোধি সোসাইটি হল (কলেজ স্কোয়ারের নিকট)
সকাল ১০টা - রাত্রি ৮টা

আদবানির পাকিস্তান সফর ও সংঘ পরিবারে বিরোধ

আদবানি পাকিস্তানে গিয়ে জিন্না সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তাকে কেন্দ্র করে বিজেপি'র মধ্যে ও সংঘ পরিবারের মধ্যে বিরোধ ও বিতর্কের জের এখনও চলছে, সংবাদপত্রেও তা প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ আদবানির পাক সফর ও মন্তব্যগুলিকে কেন্দ্র করে সংঘ পরিবারের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বিজেপি ও আরএসএস নেতাদের কাছে অজানা বা অপ্রত্যাশিত ছিল, একথা মনে করার কারণ নেই। আবার বিতর্ক যখন চরমে তখন ৫ জুলাই উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় হঠাৎ 'জঙ্গি হানার' ঘটনাটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ ঘটনার পরই দেখা গিয়েছিল, আদবানির পাক সফরকে কেন্দ্র করে বিজেপি-আরএসএস'এর মধ্যে আপাত বিরোধ চললেও, গোটা সংঘপরিবার আবার যেন ''বিভেদ ভুলে'' হিন্দুত্ববাদী একসুরে কথা বলছে। সঙ্গে সঙ্গে আদবানি সহ সংঘ পরিবারের সকলে রাস্তায় নেমে হিন্দুত্বকে কেন্দ্র করে আবার একটা হৈচৈ বাধাবারও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তেমন কোন সাড়া না পাওয়ায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এখন সেই ঘটনার জের চলে যেতেই তাদের মধ্যেকার বিতর্ক আবার সামনে চলে এসেছে। এই সমস্ত ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে কতকগুলো প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

বিজেপি এখন কেন্দ্রীয় সরকারে নেই, আদবানিও আর মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন, তিনি এখন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা। পাকিস্তান সফরে তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবেও যাননি। টানা পাঁচ বছর কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় আদবানি একটিবারের জন্যও পাকিস্তান যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি, বরং সুযোগ পেলেই পাকিস্তানকে ''এক নম্বর শত্রু রাষ্ট্র'' বলে গাল দিয়েছেন। তিনি মন্ত্রীত্ব হারাবার পর হঠাৎ পাকিস্তান যেতে মনস্থ করলেন কেন? আরও চমকপ্রদ ঘটনা হল, ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে আদবানিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল চাওয়াল জেলায় অবস্থিত অতি প্রাচীন, কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত কাতাসরাজ হিন্দুমন্দিরের পুনর্গঠন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার জন্য। আদবানি যাওয়ার সপ্তাহখানেক আগেই বিজেপি সাংসদদের একটি দল পাকিস্তান ঘুরে এসে জানায় যে, আদবানিকে দেখার জন্য পাকিস্তান উন্মুখ হয়ে আছে। করাচি আদবানির জন্মস্থান, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত আদবানি করাচিতেই ছিলেন। ভারত-পাক শান্তি প্রক্রিয়ায় দু-দেশের নেতাদের নিজ নিজ জন্মস্থান দেখার জন্য আবেগের তাড়না — এখন কূটনীতির

চারের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিল ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ

পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ গোপালনগর গ্রামের ২নং সংসদের অধীন 'আবুল কালাম আজাদ শিশুশিক্ষা কেন্দ্র'টি ২০০১ সাল থেকেই যথেষ্ট সুনাম ও সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে। আহ্‌মেদ আলি নামে স্থানীয় এক দিনমজুর এই শিক্ষাকেন্দ্রের স্থায়ী-গৃহ নির্মাণের জন্য জমিও দান করেছেন। সংখ্যালঘু অংশের পরিবারগুলির মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এই স্কুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু এখানকার স্থানীয় সিপিএম কর্মী-সমর্থকেরা পার্টির প্রতি, নেতাদের প্রতি প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ায় ঐ বিক্ষুব্ধদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁদের অনুগত বানানোর জন্য নেতারা ঐ শিশু শিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ করে দেবার ছক কষেন। নেতাদের লক্ষ্য ছিল, সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ বন্ধ করে দিলে বাবা-মায়েরা তখন এসে নেতাদের পায়ে পড়বেন। তাঁদের নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েত সমিতি এই মর্মে সিদ্ধান্তও জারি করে দেয়।

এই সংবাদে এলাকার সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। প্রশাসনের নানা স্তরে যোগাযোগ করেও তাঁরা ব্যর্থ হন। একটা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বুঝেই স্থানীয় মানুষজন সংঘবদ্ধ হন এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেন। এস ইউ সি আই কর্মীরা তাঁদের পাশে দাঁড়ান। আন্দোলন ছাড়া যে স্কুল বাঁচানো যাবে না, একথা গ্রামবাসীরা বুঝতে পেরে গড়ে তোলেন 'আবুল কালাম আজাদ শিশুশিক্ষা কেন্দ্র বাঁচাও কমিটি'। কমিটির উদ্যোগে ২৫ মে বিডিও অভিযানে সামিল হন ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, মা-বোন, পরিচালন সমিতি এবং মুখ্য সহায়িকা নিজে। মিছিলকারীরা বিডিও অফিসের সামনে ধর্নায় বসে পড়েন, অবস্থান কর্মসূচি চলতে থাকে।

বিডিও'র কাছে দাবিপত্র পেশ করে জানানো হয় যে, শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি রক্ষার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত ধর্না চলতে থাকবে। বিডিও'র সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন শিশুশিক্ষাকেন্দ্র বাঁচাও কমিটির সভানেত্রী সুনন্দা পণ্ডা, সম্পাদিকা সুফিয়া বিবি, কোষাধ্যক্ষা মাজেদা বিবি, সদস্য প্রশান্ত নায়েক ও প্রতিমা গিরি, মুখ্য সহায়িকা অমিতা প্রধান এবং শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালন কমিটির সম্পাদক আহ্‌মেদ আলি সহ ১২ জনের প্রতিনিধি দল।

বিডিও শেষ পর্যন্ত জানান, এই শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধের কোনও নির্দেশ প্রশাসন দেয়নি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে এটা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। তিনি শিশুশিক্ষা-কেন্দ্রটি চালু রাখার দাবি মেনে নেন এবং শীঘ্রই ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

শহীদ কমরেড মোকারাম খাঁ স্মরণদিবসে সভা

কুলতলীর মেরীগঞ্জ ১নং অঞ্চলে জোতদার ও কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের আক্রমণে নিহত গরিব চাষী ও খেতমজুর আন্দোলনের নেতা শহীদ কমরেড মোকারাম খাঁর ২২তম স্মরণ দিবসে ১০ জুলাই মেরীগঞ্জ খালবাড় স্কুল মাঠে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল দুর্যোগ ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রায় দুই সহস্রাধিক মানুষ এই সভায় যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন চাষী আন্দোলনের প্রবীণ সংগঠক কমরেড সোলেমান মোল্লা এবং বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিধান চ্যাটার্জী ও কমরেড দীপঙ্কর রায়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেড মোজাফ্‌ফর খাঁ, মেরীগঞ্জ ১নং লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আয়ুব খাঁ এবং বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সাইফুদ্দিন শেখ।

ইমরানা-ঘটনায় নাগরিক কনভেনশন

উত্তরপ্রদেশের মুজঃফরনগরে শ্বশুর কর্তৃক ধর্ষিতা ইমরানা বেগমের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে জারি করা অমানবিক ও বর্বর দেওবন্দ ফতোয়ার বিরুদ্ধে ১৬ জুলাই কলকাতার স্টুডেন্টস হলে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন এম এস এস রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরি। সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা চৈতালি দত্ত, মোবারক করিম জহর, আবুল বাশার, কেশওয়ার জাঁহা, কাজল সরকার এবং এম এস এস-এর সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী।

শহীদ যতীন দাস স্মরণ অনুষ্ঠান

রাজনৈতিক বন্দির প্রাপ্য মর্যাদা আদায়ের দাবিতে লাহোরের বোর্স্টাল কারাগারে ১৯২৯ সালের ১৩ জুলাই এক ঐতিহাসিক অনশন সংগ্রামের সূচনা করেন ভগৎ সিং, যতীন দাস, শুকদেব সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবীরা। সেই অনশন আন্দোলনে যতীন দাসের আমৃত্যু লড়াই এবং শহীদের আত্মদান আজও সংগ্রামী মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। টানা ৬৩ দিন অনশনের মধ্য দিয়ে ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর এই অনন্য সংগ্রামকে স্মরণ করে তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে 'শহীদ যতীন দাস জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি' গত ১৩ জুলাই তাঁর অনশন সংগ্রামের সূচনা দিবসের ৭৫তম বর্ষপূর্তি পালন করল যথাযোগ্য মর্যাদায়।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ১৩ জুলাই সকালে শহীদ যতীন দাসের জন্মস্থান শিকদার বাগান স্ট্রীট ও গণেন্দ্র মিত্র লেনের সংযোগস্থলে স্থাপিত স্মৃতিফলকে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে। মাল্যদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্যরা এবং বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। ঐদিন বিকেলে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শহীদ যতীন দাস পার্কে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অনিল মুখার্জী, কমিটির সভাপতি চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডঃ কাশীশ চন্দ্র মাইতি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রবল বর্ষণের মধ্যেও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় ছিল।

ভারত-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করতে হবে

একের পাতার পর

ভূমিকা বিশ্বশান্তি ও দুর্বল দেশগুলির সার্বভৌমত্বকে একেবারে ছারখার করে দিয়েছে, যেটা একের পর এক ঘটনায়, বিশেষত আফগানিস্তান ও ইরাকের উপর বিনা প্ররোচনায় নগ্ন ও বর্বর আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ মার্কিন এই দস্যুবৃত্তির চূড়ান্ত বিরোধিতা এবং তার বিরুদ্ধে তীব্রতম ঘৃণা প্রকাশ করে চলেছে। ভারতের জনগণও প্রথমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে যে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য নিয়ে, দ্বিধাহীন ভাষায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিক হানাদারির তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নটাই ভারতের জনমনকে সঙ্গে সঙ্গে আলোড়িত করছে যে, কীভাবে দেশের ভিতর ও বাইরে এইরকম পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার নির্লজ্জের মতো এই ক্ষতিকর চুক্তিতে স্বাক্ষর করল, যা এমনকী দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষেও বিপজ্জনক।

বলা বাহুল্য, এই চুক্তি আদৌ আকস্মিক নয়। স্বাধীনতার সময় থেকেই ভারতের শাসক বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণীস্বার্থবোধ থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে নরম মনোভাব পোষণ করে এসেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্রুততম বিকাশের স্বার্থে তদানীন্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে সাহায্য ও অনুদান পাওয়ার জন্য ভারতীয় বুর্জোয়ারা 'জোট নিরপেক্ষতা' ও 'শান্তির চ্যাম্পিয়নে'র ভূমিকা পালন করার রাস্তা বেছে নিয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি সংহত ও বিকশিত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। সাথে সাথে বিদেশের বাজার দখলের লক্ষ্য থেকে নিজস্ব প্রভাবাধীন অঞ্চল বাড়াবার সম্প্রসারণবাদী ঝোঁকও তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর, গ্যাট-বিশ্বায়নের পর্যায়ে বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের ভাগ পাওয়ার স্বার্থে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে বেশি বেশি তোয়াজ করতে শুরু করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও তার আধিপত্যবাদী কার্যকলাপের কারণে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান নিন্দাবাদের সামনে পড়ে একটি নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসাবে ভারতকে পেতে চাইছে। সুতরাং, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা পারস্পরিক স্বার্থ থেকেই ক্রমাগত বেশি করে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে।

মার্কিন-ঘনিষ্ঠ হওয়ার এই প্রবণতা পূর্বে শুরু হলেও এটা অনেক বেশি প্রকট ও ত্বরান্বিত হয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলে। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ও ভারতীয় শাসকশ্রেণীর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে এই সরকার তার মার্কিন ঘেঁষা নীতি স্পষ্ট করে দিয়েছিল। এখন সিপিএম-সিপিআইয়ের সমর্থনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারও পিছিয়ে না থেকে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর সেবায় এন ডি এ'র পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ভারতীয় জনগণের সুদীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যকে পদদলিত করে সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করল। অবশ্যই, লক্ষণীয় যে, যতদিন দেশে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলনের জোয়ার ছিল, মার্কিন শাসকরা এ ধরনের একটি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপোষক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব পর্যন্ত করতে সাহস পায়নি। সিপিএম-সিপিআইয়ের মত দলগুলি যেদিন থেকে গণআন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেছে এবং গণআন্দোলনকে পুরোপুরি নিরুৎসাহিত করতে শুরু করেছে, তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের মদতপুষ্ট গণমাধ্যমের একাংশ ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের উদ্দীপনাকে স্তিমিত করার উদ্দেশ্যে সুচতুর প্রচার চালিয়েছে এবং এভাবে দেশের মধ্যে জমি তৈরি করেই এখন ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী মার্কিন শাসকদের সঙ্গে এধরনের একটা কালা চুক্তি স্বাক্ষর করার সাহস দেখাতে পেরেছে।

কিন্তু পরিস্থিতি ও পটভূমি যাই থাক, ইউ পি এ সরকারের এই বিপজ্জনক পদক্ষেপের ফলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর গুরুতর আক্রমণ আসন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে, যার থাবা থেকে এমনকী ভবিষ্যত বিপ্লবী আন্দোলনও রেহাই পাবে না। এই চুক্তিকে কার্যকর করা থেকে যেকোনভাবে সরকারকে বিরত করতে ও শেষপর্যন্ত তা বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য দেশের প্রতিটি স্বাধীনতাপ্রিয় নাগরিকের দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসা দরকার। যাঁরা এই চুক্তির মারাত্মক বিপদের দিকটি গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন এবং তার জন্য গভীর উদ্বেগ বোধ করছেন, তাঁরা এটা লক্ষ্য করে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন যে, যখন এই বিপজ্জনক চুক্তি রুখে দেওয়ার জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষ শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সেই মুহূর্তে সিপিআই-সিপিএম তাদের দু'মুখো রাজনীতি নিয়ে চলছে। সংবাদপত্রের বিবৃতি থেকে মনে হবে, তারা চুক্তির ঘোরতর বিরোধিতা করছে। একইসাথে তারাই আবার গর্বের সঙ্গে বলছে যে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার টিকে থাকার ক্ষেত্রে তাদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। যথার্থই চুক্তির প্রতি তাদের বিরুদ্ধতা যদি আন্তরিক হত, তবে তা উপেক্ষা করে দেশের স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক এ ধরনের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে ইউ পি এ সরকার সাহস দেখায় কী করে ? তাদের বিরুদ্ধতা যথার্থ হলে শুধু মুখে বিরুদ্ধতা না করে এই চুক্তি বাতিলের জন্য তারা ইউ পি এ সরকারের উপর প্রকৃতই আন্তরিকভাবে চাপ সৃষ্টি করত। তাতে ব্যর্থ হলে, গোটা দুনিয়ায় চূড়ান্ত ধিক্কৃত যুদ্ধবাজ শক্তির সঙ্গে যে সরকার সমঝোতা করছে, তেমন সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে স্বাধীনতাপ্রিয় বিপুল ভারতবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ তারা নিত। তাদের বোঝা উচিত, দেশের মানুষ তাদের ভূমিকা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে এবং তাদের সম্বন্ধে নিজেদের অভিমতও গড়ে তুলছে। আমাদের দল এস ইউ সি আই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ এধরনের সার্বভৌমত্ববিরোধী সাম্রাজ্যবাদঘেঁষা হীন চুক্তি কার্যকর করা থেকে সরকারকে বিরত করা ও এই চুক্তি বাতিলে বাধ্য করার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবেন।

নতুন বেতন চুক্তির দাবিতে

১১ জুলাই থেকে চা-শ্রমিকরা লাগাতার ধর্মঘটে

উত্তরবঙ্গের ৩৪৩টি চা-বাগানের প্রায় ৪ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ১১ জুলাই থেকে লাগাতার ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। নতুন বেতন চুক্তিসহ অন্যান্য দাবিতে এই ধর্মঘট। গত ৩১ মার্চ ২০০৩ সালে পুরনো বেতন চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। ১ এপ্রিল ২০০৩ থেকে শ্রমিক-কর্মচারীদের নতুন বেতনহার চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২ বছর ৪ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মালিকপক্ষ নতুন বেতনচুক্তি করার কোনরকম সদিচ্ছা দেখায়নি। বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে, কিন্তু সবই কেবল নামেমাত্র বৈঠক। মালিকদের অযৌক্তিক উৎপাদনভিত্তিক মজুরির শর্ত বৈঠকগুলিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকেছে, তাই আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। ইউ টি ইউ সি -লেনিন সরণী অনুমোদিত নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নও এই ধর্মঘটের অন্যতম আহ্বায়ক। সকল চা-শ্রমিক সংগঠন এই ধর্মঘটের অংশীদার।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং জেলায় সমগ্র ভারতবর্ষে উৎপাদিত চায়ের প্রায় ২৫ শতাংশ উৎপাদন হয়, এর মধ্যে বিশ্বখ্যাত দার্জিলিং চা-ও আছে। অথচ, চা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা নির্মম শোষণের শিকার, দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী। ভারতের সমস্ত শিল্প কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চা-শ্রমিকরা সবচেয়ে কম মজুরি পেয়ে থাকেন। যেখানে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির হার দৈনিক ৮০ টাকার বেশি, সেখানে এই রাজ্যে চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির হার মাত্র ৪৫ টাকা ৯০ পয়সা। বাজারে দামের নিরিখে এই আয় দিয়ে কোনও পরিবারের দিন চলতে পারে? এই চা-শ্রমিকদের সামান্য পরিমাণে হলেও চাল-গম স্বল্পমূল্যে রেশনের মাধ্যমে দেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, সেটাও ছ-মাসেরও বেশি সময় বকেয়া পড়ে রয়েছে। অন্যান্য দেয় বিষয়গুলিও মালিকপক্ষ দিচ্ছে না। বরং যখন চা পাতা তোলার সিজন নয় সেইসময় বহু মালিকপক্ষ চা-বাগান আচমকা বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা-বাগানে কিছুদিন আগে সহস্রাধিক মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে অপুষ্টিতে ভুগে অকালে মারা যায়।

ভারতের অর্থনীতিতে চায়ের একটা প্রধান ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এই চা-সম্পদ যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে গড়ে তুলছে সেই শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম প্রাপ্যটুকুও মালিকরা দিচ্ছে না। রাজ্যে বাম নামে একটি সরকার থাকলেও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য ন্যূনতম প্রাপ্যটুকু ফাঁকি দিচ্ছে কী করে, এ প্রশ্ন আজ শ্রমিকদের মধ্যে উঠছে। মালিকদের এই ভূমিকার পেছনে রাজ্য সরকারের ভূমিকাও কম নয়। মালিকরা যখন পি-এফের টাকা জমা না দিয়ে, রেশনিং বকেয়া রেখে, হঠাৎ বাগান বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের অনাহারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে সেই সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে গিয়ে হুমকি দিলেন, 'জঙ্গি আন্দোলন চলবে না'। আজও রাজ্য সরকার চাইলে ন্যূনতম বেতন আইন-১৯৪৮ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি করে মজুরি বৃদ্ধি করতে পারে। সরকার করছে না কেন? কিছু কিছু মালিক যখন বেআইনিভাবে বাগান বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার তখন বাগানের লীজ বাতিল করে অধিগ্রহণ করেনি কেন? কেন সিটু ও আইএনটিইউসি নেতৃত্ব তাদের সরকারকে শ্রমিকপক্ষে দাঁড় করাতে ভূমিকা নিচ্ছেন না? এই সমস্ত প্রশ্ন শ্রমিকস্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মঞ্চ থেকে বিবেচনা করা অতীব জরুরি বলে আমরা মনে করি।

আজ মালিকপক্ষ বলছে, উৎপাদন-ভিত্তিক মজুরি শ্রমিকদের মেনে নিতে হবে, একথা চূড়ান্ত শ্রমিক স্বার্থবিরোধী। কারণ, উৎপাদনশীলতার উপরে শ্রমিকদের কোন হাত নেই। এটা পুরোপুরি বাগান মালিক বা কর্তৃপক্ষের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মজুরি-চুক্তির সঙ্গে উৎপাদনশীলতা যুক্ত করা আখেরে শ্রমিকদের মজুরি কাটারই নামান্তর। তাই শ্রমিক ইউনিয়নগুলি সঙ্গতকারণেই দাবি তুলেছে, উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করে মজুরি চুক্তি নয়, ন্যায্য মজুরি চুক্তি করতে হবে। এই দাবিতে গত জুন মাসে চা-বাগানে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালিত হয়েছে এবং ১১ জুলাই থেকে লাগাতার চা-বাগান ধর্মঘট চলছে। এই ধর্মঘটের চাপে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হলেও মালিকপক্ষের অনড় মনোভাবের জন্য বৈঠকে শ্রমিকস্বার্থে কোনও সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে ১৯ জুলাই ইউটিইউসি-এলএস, সিআইটিইউ, ইউটিইউসি, আইএনটিইউসি, এইচএমএস অনুমোদিত চা-শ্রমিক ইউনিয়নগুলির যুক্তমঞ্চের ডাকে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অধ্যুষিত চার জেলা — জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, কোচবিহারে ১২ ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়েছে।

ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে

১০ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচি নিল ফোরাম

সিটিজেন্‌স্ ফোরাম এগেন্‌স্ট ভ্যাট-এর উদ্যোগে গত ৭ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক সুজিত ভট্টশালী, পরিবেশবিদ চির দত্ত ও ফোরামের বিশিষ্ট সদস্য শেখ আলি হোসেন।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানান যে, ভ্যাট চালু করার সরকারি উদ্দেশ্য সম্পর্কে ফোরামের দৃঢ় অভিমত হল — ১৯৯১ সালে বিশ্বায়নের লক্ষ্যে যে নয়া আর্থিক নীতি চালু হয়েছিল, তাকে সংহত ও ব্যাপক করতেই বিক্রয়করের সর্বশেষ পরিমার্জিত সংস্করণ হল ভ্যাট। এই করনীতির মূল উদ্দেশ্য হল দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিকে আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে ঢালাও কর ছাড়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া। ১৯৮০-৮১ সালে বৃহৎ ব্যবসায়ী ও দেশি-বিদেশি এই বৃহৎ গোষ্ঠী থেকে যে কর আদায় হত তা ছিল জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশ। তা কমতে কমতে ২০০৪ সালে ৯ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজিকে ছাড় দেওয়ার ফলে জিডিপি'র ৬ শতাংশ, টাকার অঙ্কে এক লক্ষ একান্ন হাজার চৌদ্দ কোটি টাকা কমে গেল। এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য সবরকমের পণ্যকে করের আওতায় নিয়ে আসাই হল সরকারের ভ্যাট চালু করার লক্ষ্য। এর ফলে সমস্ত অংশের মানুষকে সরকার করের আওতার মধ্যে এনে ফেলার চেষ্টা করছে। আর এইভাবেই সরকার বৃহৎ পুঁজিপতিদের ছাড় দেওয়া বিরাট অঙ্কের করের বোঝা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে।

আগে বিক্রয়কর রাজ্যগুলির নিজস্ব রাজস্ব বা সম্পদ ছিল। বহু ত্রুটি সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির যতটুকু আর্থিক স্বাধিকার অবশিষ্ট ছিল ভ্যাটের ফলে তা সঙ্কুচিত হবে। রাজ্যগুলি আরও বেশি করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পণ্যে যে ভিন্ন মাশুল নীতি ছিল, যার দ্বারা তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কখনো কখনো কোনও পণ্যের দাম কমিয়ে রাখত, বর্তমানে মাশুল সমীকরণের ফলে সে সুযোগ আর রইল না।

ভ্যাটব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও তথ্য যতটুকু পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, কানাডা, ব্রাজিল ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান তারা আজও করতে পারেনি।

আমরা মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বন্ধ করার জন্য, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধ করার ও আশঙ্কা দূর করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। ভ্যাট সংক্রান্ত সকল প্রকার গোপনীয়তা পরিত্যাগ করে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে অর্থাৎ এমপাওয়ারড কমিটিকে ব্যবসায়ী সংগঠন, ক্রেতা সংগঠন ও সিটিজেন্‌স্ ফোরাম এগেনস্ট ভ্যাট — এর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ভ্যাট সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সরকারকে ঘোষণা করতে হবে — গত তিনমাসে সরকারের রাজস্ব কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩৫০টি পণ্যের ক্ষেত্রে দাম কতখানি কমেছে এবং গোটা রাজ্যের ব্যবসায়ীদের মধ্যে কত শতাংশ হিসাব রাখার পরিকাঠামো করতে পেরেছে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ভ্যাট বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিছু কর্মসূচি তাঁরা ঘোষণা করেছেন। যথা ঃ —

১। জুলাই মাসের মধ্যে সমস্ত জেলা ও ব্লকস্তরে ব্যবসায়ী সহ সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়ে যৌথ কনভেনশন এবং কমিটি গড়ে তোলা হবে এবং

২। ভ্যাট পুরোপুরি প্রত্যাহার করার দাবিতে ১০ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আগস্ট মাসের শেষার্ধে গণডেপুটেশনের মধ্য দিয়ে তা রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হবে।

জয়েন্টে মেধাতালিকাভুক্ত সকল ছাত্রের ভর্তির দাবিতে

আন্দোলনে এ আই ডি এস ও

গত দু'বছরের মত এবারও রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল জয়েন্ট এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ ছাত্রদের মেডিকেলে ভর্তির কাউন্সেলিং প্রাঙ্গণ। গত বছর সুপ্রিম কোর্ট মানবিকতার দোহাই দিয়ে বাতিল হওয়া ৬৫ জন এন আর আই ছাত্রকে সমানভাবে ভাগ করে রাজ্যের ৯টি মেডিকেল কলেজে ভর্তির নির্দেশ দেয়। ডিএসও'র পক্ষ থেকে প্রথম থেকেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যাতে সরকার এম সি আই (মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া)-এর কাছে এই বছরের জন্য অতিরিক্ত ৬৫টি আসন অনুমোদন করার জন্য আবেদন জানায়, যাতে জয়েন্ট এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ একজন মেধাবী ছাত্রও বঞ্চিত না হয়। কিন্তু সরকার এই দাবিতে কর্ণপাত করেনি।

এবছর ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফর্মের সঙ্গে যে প্রসপেক্টাস দেওয়া হয় বা ভর্তির কাউন্সেলিং করার যে নোটিশ সরকার পক্ষ থেকে ইস্যু করা হয় তার সর্বত্রই মেডিকেলে ভর্তির জন্য ১১০৫টি আসন দেখানো হয়েছিল, স্বভাবতই সাধারণ ছাত্র-অভিভাবকরা আশ্বস্ত ছিলেন যে সরকার নিশ্চয় ১১০৫টি আসনের বাইরে ৬৫টি আসন কোনভাবে ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু ১১ জুলাই কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার সময় দেখা গেল জেনারেল ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট আসন থেকেই ৬৫টি আসন কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সরকারের এন আর আই প্রীতি আবার প্রমাণিত হল যখন দেখা গেল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ৬৫ জন এন আর আই ছাত্রকে ৯টি মেডিকেল কলেজে সমানভাবে ভাগ করে না দিয়ে কলকাতার কলেজগুলিতেই প্রধানত তাদের ভর্তি করা হল। ফলে এবার এন্ট্রান্সে উত্তীর্ণ যেসব ছাত্রছাত্রীর কলকাতার মেডিকেল কলেজগুলিতে পড়ার সুযোগ পাওয়ার কথা, তারা তা পেল না। যারা এম বি বি এস পড়তে পারত তাদের ভর্তি হতে হল ডেন্টালে (বিডিএস), আর কিছু ছাত্র তো একেবারে সুযোগই পেল না। এমতাবস্থায় ছাত্র-অভিভাবকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এঁদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে ডিএসও মেডিকেল ইউনিট। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কাউন্সেলিং প্রাঙ্গনেই এসএফআই হামলা চালালে ডিএসও কর্মীরা তা প্রতিরোধ করে ; ডিএসও কর্মী সুরজিৎ মণ্ডলকে একা পেয়ে এসএফআই তার উপর হামলা চালায়। শেষপর্যন্ত ডিএসও এবং ছাত্র-অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে পড়ে ঐ স্থান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় এস এফ আই।

১২ জুলাই ছাত্র-অভিভাবকদের বিক্ষোভ চরমে ওঠে এবং ডিএসও'র উদ্যোগে সেন্ট্রাল-সিলেকশন কমিটির চেয়ারপার্সনের (ডাঃ জয়শ্রী মিত্র) কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু সরকার এই সময় পুলিশ লেলিয়ে দেয় বিক্ষোভরত ডিএসও কর্মী ও ছাত্র-অভিভাবকদের দিকে।

ডিএসও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ মৃদুল সরকার বলেন, ৬৫ জন এন আর আই ছাত্রের ভর্তির জন্য একজনও মেধা তালিকার ছাত্র যাতে বঞ্চিত না হয় সেই দাবিতে ডিএসও'র আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে ছাত্র-অভিভাবকদের সংগঠিত করে আইনি লড়াইয়ের পথেও যাবে ডিএসও।

রানিনগরে স্বাস্থ্য কনভেনশন

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে গত ১০ জুলাই রানিনগর হাইস্কুলে এক মহতী কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। কনভেনশনের প্রধান বক্তা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত হাসপাতালের অব্যবস্থা এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর ক্ষতিকারক দিকগুলি পর্যালোচনা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ আইনুদ্দিন সরকার, আলি আকবর ও সেলিনা খাতুন। এই সভায় বিমল বিশ্বাসকে সভাপতি এবং সেলিনা খাতুন ও আলি আকবরকে যুগ্মসম্পাদক করে ১৯ জনের 'রানিনগর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' গঠিত হয়।

আদবানির পাকিস্তান সফর কি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ?

একের পাতার পর

অঙ্গে পরিণত হয়েছে। দিল্লিতে নিজ জন্মস্থান দেখার জন্য পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফের সপরিবারে ভারত আগমনের পিছনে যেমন আবেগের তুলনায় রাজনৈতিক লক্ষ্যই ছিল প্রধান, আদবানির সপরিবারে পাকিস্তান যাত্রাও ছিল তেমনই পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

৩১ মে ইসলামাবাদে পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরই আদবানি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। পাকিস্তানের মিডিয়া কেবল নয়, আন্তর্জাতিক মিডিয়াকেও সেখানে আহ্বান করা হয়। অর্থাৎ আদবানি চেয়েছেন যাতে তার অভিমত সারা বিশ্বে প্রচার পায়, ভারত-পাক শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে বিশেষত পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সংবাদ অন্যান্য রাষ্ট্রে যাঁদের শোনানো দরকার তাঁরাও যেন শোনেন। ঐ সম্মেলনেই তাকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর তাঁর কাছে ''জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন'' এবং একথা তিনি ইতিপূর্বেও বলেছেন। তাছাড়া ঐ সম্মেলনে আদবানির অতীতের পাকবিরোধী বিবৃতিগুলি নিয়ে এবং বিজেপি'র পত্রপত্রিকায় কেন সর্বদা পাকিস্তান ও মুসলিমদের টার্গেট করা হয় সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে আদবানি বলেন, সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করেই তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলেছেন, কিন্তু পাকিস্তান নিজেই যখন ''সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আন্তর্জাতিক জোটের শরিক হয়েছে'' তখন পাকিস্তান সম্পর্কে ঐ অভিযোগ আর দাঁড়ায় না। লক্ষ্যণীয় যে, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জোটের প্রবক্তা হচ্ছে প্রধানত মার্কিন শাসকরা এবং মার্কিন চাপেই পাকিস্তান ঐ তথাকথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী জোটের শরিক হয়েছে। এ ঘটনাতেই সন্তোষ প্রকাশ করে আদবানি বুঝিয়ে দিলেন যে, ভারত-পাক মৈত্রীর যে পরিবেশটা এখন আমেরিকা, তার নিজের স্বার্থে তৈরি করতে চাইছে, এই উপমহাদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা অনুযায়ী যেভাবে ভারত-পাক তথাকথিত শান্তিপ্রক্রিয়া এগোচ্ছে তার প্রতি ভারতের দ্বিতীয় প্রধান বুর্জোয়া দল হিসাবে বিজেপি'র পূর্ণ সমর্থন আছে। বিজেপি'র বিশেষত আদবানির নিজের ''মুসলিম বিদ্বেষ'' ভাবমূর্তি কাটাতে ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে আদবানি হতাশার সুরে বলেন, প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই একটা ''পাবলিক ইমেজ'' তৈরি হয়, যেটা ব্যক্তিটির প্রকৃত চরিত্র ও ধ্যানধারণার সাথে মেলেনা। তাঁর নিজের ভাবমূর্তি সম্পর্কেও এই দুঃখজনক ব্যাপারটাই ঘটেছে। অর্থাৎ, আদবানিকে যেভাবে ''মুসলিমবিদ্বেষী'' রূপে চিত্রিত করা হয়, তিনি তা নন। আদবানির পাক সফরের পিছনে বিজেপি ও তাঁর নিজের এতদিনকার ভাবমূর্তিকে বদল করার উদ্দেশ্যই যে কাজ করেছে সেটা ঐ সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই বাইরের দুনিয়ার কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করে।

এরপর আদবানি যান কাতাসরাজ হিন্দুমন্দিরের সংস্কার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে। অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ আদবানি বলেন, ''পরিবেশ পরিস্থিতি যথার্থই বদলেছে।'' তারপরই একটি অনুষ্ঠানে তিনি পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, ''পাকিস্তানের মাটিতে যেমন ভারতের প্রতি বিরূপতার স্থান নেই, ভারতের বুকেও তেমনই পাকিস্তানের প্রতি বিরূপতার স্থান নেই। বিশেষ করে আমার পার্টি বিজেপি সম্পর্কে আমি পাকিস্তানের জনগণকে জানাতে চাই যে, পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম দু'টি রাষ্ট্র রূপে ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুত্থান ইতিহাসের একটি বাস্তব ঘটনা, যাকে বদলানো যাবে না। আমাকে এটা জোর দিয়ে বলতে হচ্ছে, তার কারণ পাকিস্তান সম্পর্কে বিজেপি'র চিন্তাভাবনা কী সে বিষয়ে আজও ভুল ধারণা রয়েছে, মিথ্যা প্রচারও চলছে।'' এরপরই তিনি বলেন, ''১৯৯৯ সালে বিজেপি সরকারই ভারত-পাক শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। এ ঘটনার পর বিজেপি'র বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরূপতার অভিযোগ দাঁড়ায় না।''

বিজেপি'র ও আদবানির এইসব মূল রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কিত বক্তব্য বাদ দিয়ে, লক্ষ্যণীয়ভাবে শুধু মহম্মদ আলি জিন্না সম্পর্কে আদবানির বক্তব্য নিয়েই সংঘ পরিবারে হৈ চৈ তোলা হয়েছে। বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে পাকিস্তান ও মুসলিমদের যে স্থানটা এতকাল দেওয়া হয়েছে, তার বিচারে আদবানির বক্তব্য একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া বলা যায়। বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের হিন্দু সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের কাঠামোটাই গড়ে তোলা হয়েছে মুসমিল ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে পৃথক বলে চিহ্নিত করার ভিত্তিতে। হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ অনুযায়ী মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনগণ কেবল বহিরাগতই নয়, তাদের উগ্র মতান্ধতা ও ধ্বংসাত্মক স্বভাব ভারতীয় সভ্যতার অপরিমেয় ক্ষতি করেছে। এই ধারণা ভি ডি সাভারকার ও এমএস গোলওয়ালকারের মতো সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রবক্তারাই প্রথম নিয়ে আসেন, পরে সেটাই সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এদের মতে মুসলিম জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত নয়, এবং তাদের এই পৃথকতার মনোভাবেরই চূড়ান্ত রূপ হিসাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি। এজন্যই হিন্দুত্ববাদীরা ১৯৪৭ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান সৃষ্টির রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের চোখে পাকিস্তান একটি অবৈধ রাষ্ট্র, যার অবসান ঘটানোই সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ ও যেটা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে সংঘ পরিবার ১৯৪৭ সাল থেকে নিরন্তর চেষ্টা করে এসেছে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে যুক্ত করে একটি ঐক্যবদ্ধ হিন্দু রাষ্ট্র অখণ্ড ভারতবর্ষ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং তার দ্বারা পাকিস্তান সৃষ্টির ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে পাল্টে দেওয়া। তারা ভারত বিভাগের জন্য মুসলিম জনগোষ্ঠীকেই দায়ী করে এবং ব্রিটিশ শাসকদের সমর্থনপুষ্ট মহম্মদ আলি জিন্নাকেই ভারত ভাগের প্রধান রূপকার বলে মনে করে। আদবানিও বরাবর এই রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ীই যুক্তি করেছেন।

সাম্প্রদায়িক প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে পাকিস্তানকে রেখে সংঘ পরিবার তার যে মূল লক্ষ্যটা হাসিল করতে চেয়েছে, তা হচ্ছে, ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে 'বর্বর' হিসাবে চিহ্নিত করা। এই উদ্দেশ্যেই অন্যান্য বহু ইস্যুর মধ্যে তারা মুসলিম শাসকদের দ্বারা হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ঘটনাকেই মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে হাতে তুলে নেয়। আর এস এস-এর নিজস্ব ও স্বঘোষিত ইতিহাসবিদদের দিয়ে ১০০০টি মন্দিরের তালিকা বানিয়ে বলা হয়, এগুলি সবই মুসলিম শাসকরা ধ্বংস করেছে। বদলা নিতে হলে ঐ ১০০০টি মন্দিরের পুনর্দখল নিতে হবে। এটাই হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম একটি কর্মসূচী। অবশ্য কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজীব গান্ধী বাবরি মসজিদের তালা খুলে ''রাম পূজার'' ব্যবস্থা না করে দেওয়া পর্যন্ত আর এস এস-এর এই সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী মাথা তুলতে পারেনি। ঐ ঘটনার পরই অযোধ্যায় ৫০০ বছরের পুরনো বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির নির্মাণ আন্দোলন প্রাণ পেয়ে যায় এবং আদবানিই তাতে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে আসরে নামেন। রামজন্মভূমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ইস্যুর পিছনে বিশাল জনমত তৈরি করে বিজেপি রাজনৈতিক ফয়দা তুলে নেয়। হিন্দুদের ধর্মীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী নেতা হিসাবে আদবানির নামে জয়ধ্বনি ওঠে। লোকসভায় বিজেপি'র আসনসংখ্যা লাফ দিয়ে বৃদ্ধি পায়। বিজেপি'র রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। আদবানি ''লৌহপুরুষ'' রূপে আখ্যায়িত হন। পাঁচ বছর কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার পর ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি'র পরাজয় ঘটতেই দলে যখন হতাশা ক্রমবর্ধমান, তখন আবার আদবানিকে বিজেপি'র সভাপতি রূপে ফিরিয়ে আনা হয় এই আশায় যে তিনি বিজেপিকে পুনরায় চাঙ্গা করে তুলবেন।

এহেন নেতা যখন বেসরকারি সফরে পাকিস্তানে গিয়ে হিন্দুত্ববাদী বচনের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেন, পাকিস্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেন, অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে রায় দেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণী দেন, তখন তার রাজনৈতিক বার্তা ও তাৎপর্য বুঝতে একদিকে পাকিস্তান শাসকদের অসুবিধা হয়নি, যেজন্য তারা আদবানির বক্তব্যের ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেছে, অন্যদিকে আর এস এস নেতাদের কাছেও আদবানির বক্তব্য অবোধ্য ঠেকেনি।

একথা মনে করা অবাস্তব যে, আদবানি নিছক ব্যক্তিগত বা গুটিকয়েক ঘনিষ্ঠ নেতার পরিকল্পনা মতই পাক সফরে গিয়ে উল্লিখিত অভিমতগুলি ব্যক্ত করেছেন। আবার বিজেপি'র অভিমত হিসাবে কথাগুলো বললেও ঠিক যেভাবে ও ভাষায় তিনি বলেছেন, সপরিবারে সফরে গিয়ে নিজের সাম্প্রদায়িক মলিন ভাবমূর্তিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আহ্বান দিয়ে পাল্টাতে চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে তার নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছুই কাজ করেনি, এভাবে বিচারও যান্ত্রিক হবে। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের শেষপর্বে এসে প্রবীণ আদবানির ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বাসনা যাই থাক, তার পাক সফরসূচী, বিজেপি'র দলগত পরিকল্পনার ভিত্তিতেই স্থির হয়েছিল। এবং আজও বিজেপি'র সংগঠনের মূল নিয়ন্ত্রণ আর এস এস-এর হাতে থাকায়, আর এস এস নেতৃত্বের পূর্ণ সমর্থন ও সম্মতি ছাড়া আদবানি পাকিস্তানে গিয়েছেন, একথা ভাবাই যায় না। পাকিস্তানে গিয়ে আদবানি কী বলবেন, অন্ততঃ বক্তব্যের দিশা কী হবে তার অনেকটাই পূর্ব নির্ধারিত ছিল। অন্যথায় পাকিস্তান সরকার হিন্দুমন্দির সংস্কার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য, আর যাকেই হোক্ কট্টর পাকবিদ্বেষী বলে সুপরিচিত আদবানিকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানাত না, তাঁর সফরের এত প্রচারও দিত না। আবার আর এস এস নেতৃত্বও কি জানত না আদবানি কী বলবেন? তাই যদি হয়, তাহলে আদবানি যখন তাঁর ''বিতর্কমূলক'' অভিমত ব্যক্ত করছিলেন, কিংবা দিল্লিতে ফিরে ৬ জুন বিজেপি'তে পদত্যাগপত্র পেশ করেন, তখন আর এস এস নেতৃত্ব নীরব ছিল কেন? বরং প্রশ্নের জবাবে আর এস এস প্রধান সুদর্শন ও অন্য শীর্ষ নেতারা বলেছিলেন, এটা বিজেপি'র আভ্যন্তরীণ সমস্যা, তারাই এর সমাধান করবে। (ফ্রন্ট লাইন পত্রিকায় উদ্ধৃত, ১.৭.০৫)।

এই সমাধান সূত্র বের করতেই ১০ জুন বিজেপি'র শীর্ষ নেতাদের বৈঠক হয়। তাতে যোগ দেন বিজেপি'র সংসদীয় বোর্ডের সদস্যরা, দলের জাতীয় কর্মাধ্যক্ষরা ও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা। সেখানেই আদবানির পাক সফর সম্পর্কে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, আদবানির পাক সফর প্রসঙ্গে সমস্ত বিতর্কমূলক ইস্যুগুলির সমাধান হয়ে গিয়েছে এবং সংঘ পরিবারের গরিষ্ঠ অংশই এই সমাধান সূত্রে সন্তুষ্ট। ঐ সর্বসম্মত প্রস্তাবে কিন্তু আদবানির পাক সফরকে 'নতুন পথের সূচনা' হিসাবে অভিহিত করে বলা হয় ''অটলবিহারি বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, তার ধারাবাহিকতাতেই আদবানির পাক সফর দু-দেশের জনগণকে আরও কাছাকাছি এনে দিয়েছে, পর্বতপ্রমাণ ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে সাহায্য করেছে, উন্নত সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছে। কাতাসরাজ মন্দিরের পুনর্গঠন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে আদবানিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রশংসা করা হয়। একমাত্র জিন্না সম্পর্কেই আদবানির বক্তব্য নস্যাৎ করে দিয়ে জিন্নাকে সাম্প্রদায়িক রূপে অভিহিত করে বলা হয়, ''পাকিস্তানকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন জিন্নাই।'' এই প্রস্তাব সম্পর্কে সূচনায় আর এস এস-এর মুখপাত্র রাম মাধব-এর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সন্তোষই প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, বিজেপি নিজ অবস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছে, এবং এটাই সঠিক ইতিহাস। তবে এই বিতর্ক এড়ানো যেত, যাই হোক বিতর্ক-বিরোধ আর নেই। এভাবেই আর এস এস নেতৃত্ব, জিন্না প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে পাকিস্তান ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে আদবানির বক্তব্যের সমর্থনেই দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু বেঁকে বসে বিশ্ব হিন্দুপরিষদ ও তার কর্মীবাহিনী। তাদের নেতা প্রবীন তোগাড়িয়া হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'বিজেপি'র প্রস্তাব কিছুই সমাধান করেনি, বহু প্রশ্নই অমীমাংসিত রয়েছে। কিছুতেই আদবানিকে আর হিন্দুত্ববাদী নেতা হিসাবে তারা মেনে নেবে না। দেশের হিন্দুদের কাছে আদবানিকে ক্ষমা চাইতে হবে ও রাজনৈতিক পদ (অর্থাৎ, সভাপতির পদ) ছাড়তে হবে। এছাড়া অন্যকোন কিছুতেই বিশ্বহিন্দু পরিষদ সন্তুষ্ট হবে না।'' এরপরই দেখা গেল আরএসএস নেতৃত্ব আবার ''মতাদর্শের'' কথা বলে কট্টর ভাব দেখিয়ে, আদবানির নাম না করে, কড়া বিবৃতি দিতে শুরু করে। বিজেপি ও আরএসএসের মধ্যে নীতিগত সংঘাতের নানা সংবাদ প্রকাশিত হয়। এন ডি এ'র শরিক দলগুলিও এই 'বিতর্কে' যোগ দিয়ে আদবানির সমর্থনে বিবৃতি দিতে থাকে। বিবৃতির এই লড়াই এখনও চলছে।

বিজেপি'র তুলনামূলক সুসংহত রাজনৈতিক কাঠামো, 'হিন্দুত্বে'র পরিবর্তে নির্বাচনী প্রচারে সড়ক-বিজলি-পানি'র প্রতি গুরুত্ব প্রদান, বাজপেয়ী শাসনে পাক-ভারত সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সূত্রপাত এবং সমগ্র ঘটনাপ্রবাহ খুঁটিয়ে বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এবং আমরা উপরের আলোচনাতেও দেখিয়েছি যে, আরএসএস ও বিজেপি নেতৃত্বের সম্মতি ও পরিকল্পনা ছাড়া আদবানির পক্ষে পাকিস্তানে গিয়ে, দলের মূলনীতির প্রশ্নে সম্পূর্ণ ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন হল, আরএসএস-বিজেপি'র মধ্যে এই ভোল বদলের ভাবনা এল কেন? কী তাদের স্বার্থ ও লক্ষ্য? এখানে বিজেপি'র প্রধান স্বার্থ বা লক্ষ্যই হচ্ছে, আবার কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতাটি পাওয়া। একবার সরকারি ক্ষমতা ভোগ করার স্বাদ পেয়ে তা হারিয়ে গোটা সংঘ পরিবারের শোচনীয় অবস্থা। তাদের হিসাব অনুযায়ী, ইউপিএ জোট পুরো পাঁচ বছর টিকবেনা, ভেঙে যাবে, তখন বিজেপি'র সামনে সরকার করার সুযোগ আসবে। কিন্তু সেই সুযোগ নিতে হলে জোট চাই, এনডিএ'কে টিকিয়ে রাখা চাই, পারলে নতুন শরিক আনতেও হবে। এক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণে বাজপেয়ির অক্ষমতা সমস্যা সৃষ্টি করছে। যেসব ক্ষমতালিপ্সু আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলকে কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগ দিয়ে বিজেপি জোটে টেনেছিল, তাদের মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক আছে, যেজন্য গত সরকারে বিজেপি তার কিছু সাম্প্রদায়িক কর্মসূচিকে জোটের কর্মসূচি থেকে বাদ দিয়েছিল এবং জোটের নেতা হিসাবে বাজপেয়িকে অসাম্প্রদায়িকতার মুখোশ পরানো হয়েছিল। আর, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের মতো সংঘ পরিবারের শাখাগুলির উগ্র কর্মীদের মন রাখার ভূমিকা নিয়েছিলেন আদবানি। এখন বাজপেয়ির

ছয়ের পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন

সোভিয়েটেই হিটলার বাহিনী প্রথম সমগ্র জাতির প্রতিরোধের সামনে পড়ে

ষষ্ঠ পর্ব

(মহান নেতা স্ট্যালিনের আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে বলীয়ান দুর্ধর্ষ জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীকে শেষপর্যন্ত ঠিক কীসের জোরে এবং কেমনভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, শুধু সোভিয়েট ভূখণ্ড নয় — ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিকেও ফ্যাসিস্ট-দখলমুক্ত করেছিল, সেদিনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও জনগণের প্রতি নেতার আস্থা ও বিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল — সেই ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। সোভিয়েটের জনগণ সমাজতন্ত্র চায়নি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙতে চেয়েছে, সেজন্যই সমাজতন্ত্র ভেঙেছে — এই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী প্রচারের মোকাবিলায় আমাদের জানা দরকার কীভাবে সোভিয়েট জনগণ সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়েছে। শোষিত জনগণ এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবীদের কাছে এ এক অমূল্য ইতিহাস — যা না জানলে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণাই অপূর্ণ থেকে যাবে, যা জানলে শোষণমুক্তির লড়াই আরও ধারালো হবে। এই লক্ষ্য থেকেই সেদিনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী)

সোভিয়েটের উপর জার্মান আক্রমণের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত। ফ্যাসিস্ট সমরবাহিনী সোভিয়েট এলাকায় ধ্বংসোন্মত্ত। ৩০ জুন সোভিয়েট প্রতিরক্ষার সর্বোচ্চ সংস্থা 'স্টেট কমিটি অফ ডিফেন্স' গঠিত হয় ; তার নেতা নির্বাচিত হন স্ট্যালিন।

যুদ্ধের প্রথম দিনগুলিতে কঠোর লড়াই চলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে। অপরিসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায় সোভিয়েট সীমান্তরক্ষীদের সাব-ইউনিটগুলো। মাটি কামড়ে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালায় তারা। সীমান্ত লড়াইয়ের এমনই একটি স্থান হল ব্রেস্ট দুর্গ। চতুর্দিক থেকে শত্রু-অবরুদ্ধ ব্রেস্ট দুর্গের সেনারা মাসাধিককাল প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। মৃত্যুর আগে দুর্গ প্রাকারে তাঁরা লিখে যান ''আমরা পাঁচ জন — সেদোভ, গ্রুদোভ, বগোলুব, মিখাইলোভ ও সেলিভানোভ। আমরা লড়াই শুরু করি ২২-৬-৪১ তারিখে ৩টা ১৫ মিনিটের সময়। আমরা মরব, কিন্তু হটব না।'' অপর একজন লেখেন — ''আমি মরছি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করছি না। বিদায় মাতৃভূমি। ২০-৭-৪১।'' এমন অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ঘটতে থাকে সোভিয়েটের মাটিতে।

আক্রমণের এক সপ্তাহ পর ২৯ জুন হিটলারের জেনারেল এফ. গাল্‌ডের তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, ''রণাঙ্গন থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, রুশরা সর্বত্র শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত লড়ছে, কেবল এক-আধ জায়গায় আত্মসমর্পণ করছে'' (সামরিক ডায়েরি, খণ্ড ৩, বই - ১, পৃঃ ৩১৭)। ফিল্ড মার্শাল ক্লেইস্টও পরবর্তীকালে বলেছিলেন, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী শুরু থেকেই ''গঠিত হয়েছিল সেরা যোদ্ধাদের নিয়ে এবং ওরা লড়েছিল অসাধারণ দৃঢ়তা ও বিস্ময়কর স্থৈর্যের সঙ্গে।'' (দ্য জার্মান জেনারেলস্ টক — হার্ট, বি লিডেল)।

সোভিয়েট যোদ্ধাদের অসীম বীরত্ব ও অটল প্রতিরোধ ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিদ্যুৎগতি অভিযানকে রুখে দেয়। এক একটি এলাকায় এক মাস, দু মাস, তিন মাস পর্যন্ত তাদের আটকে থাকতে হয়। সোভিয়েট প্রতিরোধ যোদ্ধারা শেষপর্যন্ত প্রাণ দিয়েও নাৎসি আক্রমণের গতিকে শ্লথ করে দেয়। জার্মানির সৈন্য ধ্বংস হয়, অস্ত্র ধ্বংস হয় ; এইভাবে সোভিয়েট পরিকল্পনা এগিয়ে চলে। পরবর্তী দিনগুলোর প্রাথমিক লড়াইতে অংশগ্রহণ করে পশ্চিম সীমান্তবর্তী সামরিক অঞ্চলের সেনারা — মোট ১৭০ ডিভিশন এবং জুলাইয়ের শুরুতে লড়াইয়ে নামে দেশের অভ্যন্তরভাগ থেকে আসা স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ বাহিনী।

স্ট্যালিনের বেতার ভাষণ সর্বাত্মক প্রতিরোধের ডাক

জার্মান আক্রমণের দ্বাদশ দিনে ১৯৪১-এর ৩ জুলাই বেতার ভাষণে রুশ জনগণের উদ্দেশে উদাত্ত আহ্বান জানালেন স্ট্যালিন। সম্বোধনে তিনি বলেন, ''আমার দেশবাসী ভাইবোনেরা, নাগরিক ও কমরেডগণ, আমাদের সেনা ও নৌবাহিনীর যোদ্ধারা, আজ আমি আপনাদের উদ্দেশেই বলছি।'' তারপর বললেন, ''বিশ্বাসঘাতক হিটলারপন্থী জার্মানি আমাদের পিতৃভূমির উপর গত ২২ জুন যে সামরিক আক্রমণ শুরু করে, তা এখনও চলছে। ... হিটলার বাহিনী লিথুয়ানিয়া দখল করতে সফল হয়েছে, লাতভিয়ার একটা বড় অংশ, পশ্চিম বেলারুশ ও ইউক্রেনের পশ্চিম অংশ দখল করেছে। ফ্যাসিস্ট বিমানবহর আক্রমণের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করছে। মুর্মানস্ক, ওরশা, মগিলেভ, স্মোলেনস্ক, কিয়েভ, ওডেসা ও সিবাস্তিপোলের ওপর তারা বোমাবর্ষণ করে চলেছে। ... দেশের সামনে আজ গভীর বিপদ।'' কিন্তু তাতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। স্ট্যালিন বললেন, ''কোনও সেনাবাহিনীই অপরাজেয় নয়। অতীতেও ছিল না, এবং আজও নেই। ইউরোপের মাটিতে তারা (হিটলার বাহিনী) কোন দৃঢ় প্রতিরোধের সামনে পড়েনি। একমাত্র আমাদের দেশের মাটিতেই তাদের যথার্থ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে এবং লালফৌজের প্রতিরোধের আঘাতে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সবচেয়ে সেরা ডিভিশনগুলিকে পরাজয় মানতে হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে, এই সেনাবাহিনীকেও ধ্বংস করা সম্ভব।'' তারপর বললেন, ''ট্যাঙ্ক এবং জঙ্গি বিমানে সুসজ্জিত ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনী অমিত শৌর্যের সঙ্গে লড়াই করছে। অসংখ্য প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে বহু আত্মদানের মধ্য দিয়ে লালফৌজ ও লাল নৌবাহিনী প্রতি ইঞ্চি সোভিয়েট ভূমির জন্য মরণপণ লড়াই চালাচ্ছে। হাজার হাজার ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধবিমানে সজ্জিত লালফৌজের মূল শক্তি এখন যুদ্ধে নামছে। লালফৌজের সৈনিকরা বীরত্বের অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করছে। শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ সবদিক থেকে আরও জোরদার হচ্ছে। ... শত্রুর পরাজয় অনিবার্য, জয় আমাদের হবেই।'' সেই সঙ্গে রুশ জনগণের উদ্দেশে তিনি নির্দেশ দিলেন, ''কোথাও লালফৌজ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলে, সেখান থেকে সমস্ত ধরনের যানবাহন সরিয়ে নিতে হবে, যাতে একটিও রেলইঞ্জিন, একটিও রেলগাড়ি শত্রুর হাতে না পড়ে, এক পাউন্ড শস্য, এক গ্যালন পেট্রলও যেন তারা না পায়।'' তিনি বললেন, ''যৌথ খামারের চাষীরা অবিলম্বে সমস্ত গবাদি পশু সরিয়ে দিন এবং সমস্ত ফসল ফ্রন্টের পিছনে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিন। ধাতু, শস্য এবং জ্বালানি তেল সহ সমস্ত সম্পদ যা সরানো যাবে না, তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এর অন্যথা যেন কোনমতেই না হয়।'' নির্দেশ দিলেন, ''শত্রু কবলিত এলাকায় ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক গেরিলাবাহিনী অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। শত্রুর উপর আঘাত হানার জন্য, শত্রুকে ভুল পথে চালনা করার জন্য ছোট ছোট গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। সর্বত্র গেরিলা হানাদারি চালিয়ে যেতে হবে। সেতু, রাস্তা, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ লাইন উড়িয়ে দিতে হবে। অরণ্য, গুদাম, যানবাহন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শত্রুকবলিত এলাকায় এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে শত্রু ও তার সহযোগীরা সেখানে তিষ্ঠতে না পারে। পদে পদে তাদের ঘেরাও করে মেরে শেষ করে দিতে হবে। শত্রুর সমস্ত কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিতে হবে। ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে এই যুদ্ধ একটা সামান্য যুদ্ধ নয়। এটা কেবলমাত্র দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, এ হল জার্মান ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র সোভিয়েট জনগণের যুদ্ধ। ... কমরেডস্, আমাদের শক্তি অপরিমেয়। গর্বোদ্ধত শত্রুপক্ষ বহু মূল্য দিয়ে এ সত্যটা অচিরেই বুঝতে পারবে। আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে লালফৌজের পাশে দাঁড়াতে বহু হাজার শ্রমিক, যৌথ খামারের কৃষক ও বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসছেন। সোভিয়েটের আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ মহাশক্তি রূপে জেগে উঠবে।'' সর্বশেষে তিনি আহ্বান জানালেন, ''আসুন, ... শত্রুর বিনাশে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করি। এগিয়ে চলুন, জয় আমাদেরই।''

স্ট্যালিনের আহ্বান সমগ্র জনগণকে উদ্দীপ্ত করে দেয়

স্ট্যালিনের এই বেতার ভাষণ সর্বস্তরের সোভিয়েট জনগণের মধ্যে গভীর আস্থা ও প্রবল উদ্দীপনার জন্ম দেয়। যোদ্ধারা তো বটেই, অসামরিক জনগণও নিজ নিজ ক্ষেত্রে কার্যত যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। গুপ্ত গেরিলা অভিযানে, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে — সর্বত্রই তাদের মধ্যে সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত ধ্বনিত হতে থাকে স্ট্যালিনের আহ্বান — ''আমার দেশবাসী ভাই-বোনেরা, আমাদের শক্তি অপরিমেয় ... আসুন, ... শত্রুর বিনাশে আমরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করি।'' ব্রিটিশ লেখক প্যাট স্লোয়ান তাঁর ''রাশিয়া রেজিস্টস্'' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লেখেন, ''স্ট্যালিনের ৩ জুলাইয়ের আহ্বান উৎপাদনের কাজে অভাবনীয় উদ্দীপনা এনে দেয়। ... সোভিয়েটের কারখানায় কারখানায় স্লোগান ওঠেঃ 'লালফৌজ যেভাবে যুদ্ধ করছে, তেমন জীবনপণ করে কাজ কর। শিল্পের মতো কৃষিতেও দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিপুল যজ্ঞ শুরু হয়।'

প্যাট স্লোয়ান লেখেন, ''...কর্মক্ষম সকল পুরুষ মহিলা ও যুবকরা খেতের কাজে যোগ দেয়। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য যাদের কাজ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, তাদের অভাব মিটিয়ে দিতে ছাত্ররা ও স্কুলের শিশুরাও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে খেতের কাজে নেমে যায়। শুধুমাত্র খারকভ শহরের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই গ্রামে যায় ১২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক।

''কিন্তু খাদ্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হচ্ছে, জাতীয় জরুরি অবস্থায় সাড়া দিয়ে যৌথ খামারের চাষীরা বাস্তবে শহরগুলিতে খাদ্য সরবরাহ বাড়িয়ে দেয় এবং কোনও দাম বৃদ্ধি না করেই। এর ফলে, ইতিহাসে এই প্রথম শান্তির সময়ের চেয়ে যুদ্ধের সময়ে, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, চাষীরা বেশি খাদ্যের যোগান দেয়। এবং যুদ্ধের সময় মুনাফাবাজদের কার্যকলাপ, যা বাকি বিশ্বে একটা সর্বজনীন ঘটনা, সোভিয়েট ইউনিয়নে তার অনুপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।''

গ্রামে গ্রামে সোভিয়েট প্রতিরোধ প্রসঙ্গে স্লোয়ান আরও লেখেন, ''যৌথ খামারের চাষীরা লুঠেরাদের বিরুদ্ধে পাহারায় অংশ নিচ্ছে। আজকের কোন সোভিয়েট গ্রামে কোন অচেনা ব্যক্তি প্রবেশ করে নিজের পরিচয়ের প্রমাণপত্র দেখাতে না পারলে বিপদে পড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে একটি গ্রামের পাশের জমিতে হঠাৎ একটি নাৎসি বিমান বাধ্য হয়ে নেমে পড়ে। তিনজন আরোহী নামতেই দেখে, কৃষক রমণীরা বিমানকে ঘিরে ফেলেছে, হাতে তাদের কাঁটাওয়ালা লাঠি, বঁটি, হাতুড়ি ও আঁকশি। জার্মানরা কোন বাধা দিতে পারেনি, ঘেরাও হয়ে যায়। এক সামরিক অফিসার কুন্টে বলে — ''আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, আমরা জার্মান অফিসারেরা কৃষক মহিলাদের হাতে বন্দি হয়েছি! আমি অনেক যুদ্ধ করেছি, কিন্তু কখনো অতি-সাধারণ লোকদের দ্বারা এমন প্রতিরোধের সামনে পড়িনি।'' এরপর স্লোয়ানের মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লেখেন, ''জাতীয় প্রতিরক্ষার লড়াইতে সোভিয়েটের সমগ্র জনগণ যেভাবে ঝাঁপ দিয়েছে তাতে পরিষ্কার যে, সোভিয়েট জনগণের মধ্যে একটা একতা, ঐক্যের একটা শক্ত বাঁধুনি অবশ্যম্ভাবীরূপে কাজ করছে। কীভাবে এটা সম্ভব ? এর রহস্য কোথায় ? এই রহস্যের পিছনে সরল সত্যটি হচ্ছে — সোভিয়েটের জনগণ জানে যে, যাবতীয় কৃষি খেতখামার, জমি, কলকারখানা — সবকিছুর মালিক তারাই। ... সোভিয়েট শ্রমিকরা জানে, উৎপাদনে তারা যে বাড়তি শ্রম দিচ্ছে তা থেকে কেউ মুনাফা করবে না, তা থেকে কেউ বিলাস-ব্যসনে দিনযাপন করবে না। একজন রুশ রেলশ্রমিক বা উক্রেনীয় খনিশ্রমিক যুদ্ধকালীন যে অতিরিক্ত শ্রম দান করছে, তা থেকে কোন অর্থশালী গোষ্ঠী অধিক লভ্যাংশের দাবি করবে না। তার ফলে তারা যখন তাদের সবচেয়ে বেশি শ্রম দান করছে তখন তাদের এই অনুভূতি হচ্ছে না যে, তাদের কাজ 'করানো' হচ্ছে এবং তার দ্বারা কারও কোন মুনাফা অর্জিত হবে। ... মুনাফাবাজরা নিশ্চিহ্ন — প্রায় পুরো নিশ্চিহ্ন।...''

স্লোয়ান আরও বলেন, ''একটা বাড়িতে যদি আগুন লাগে, তবে শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সারা পরিবার আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার যা সামর্থ্য তাই দিয়ে সে কিছু করবার চেষ্টা করে। ঠিক একই জিনিস ঘটেছে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে। সোভিয়েট তাদের পরিবার ; স্ট্যালিন তাঁর ভাষণের সম্বোধনে যখন 'দেশবাসী ভাইবোনেরা' বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন সেটা শুধু কথার কথা ছিল না, সম্বোধনের ঐ শব্দগুলো একটা তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করছিল। ... সমগ্র সোভিয়েট জনগণ যুদ্ধে যে ঝাঁপ দিল — এখানেই রয়েছে তার রহস্য।''

লালফৌজ ও সোভিয়েট জনগণ জয়ের লক্ষ্যে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলে। বিশ্বের মানুষ সেই প্রতিরোধের সংবাদে বিস্ময়ে ও আনন্দে আপ্লুত হয়ে যায়। হিটলারের নাৎসি বাহিনীর কাছেও এই প্রতিরোধ ছিল অপ্রত্যাশিত। ফ্যাসিস্ট সমরনায়কদের সমস্ত পরিকল্পনা ও হিসেবনিকেশ মুহুর্মুহু গুলিয়ে যেতে থাকে, তাদের আবার নতুন প্ল্যান সাজাতে হয়, আবার সেটাও ভণ্ডুল হয়ে যায়। এমনই চলতে থাকে।

নাৎসি পত্রিকা ফ্রাঙ্কফুর্ট জেইটুং-এর সামরিক সংবাদদাতা স্বীকার করতে বাধ্য হন, ''জার্মান জনগণকে বুঝতে হবে যে, রুশ যুদ্ধ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জটিল এবং সেটা এইজন্য নয় যে অনেক দূর থেকে গিয়ে জার্মান বাহিনীকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে ; আসল কারণ — বেলজিয়ান, ফরাসি ও যুগোশ্লাভ বাহিনীর তুলনায় লালফৌজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন।'' তারা আরও লেখে, ''সোভিয়েট ফৌজ আত্মসমর্পণ করতে বা পিছু হটতে চাইছে না। শত্রুবাহিনীর নৈতিক বিপর্যয় — যা পশ্চিমাঞ্চলে জয়লাভের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল — সেটা কিন্তু পূর্বাঞ্চলে ঘটছে না।'' (১০ জুলাই ১৯৪১ ডেইলি টেলিগ্রাফ-এ উদ্ধৃত)। ডেইলি টেলিগ্রাফ (১ আগস্ট ১৯৪১) লিখছে, ''সোভিয়েট ফৌজ প্রুশিয়ানদের পিষে ফেলছে। নাৎসিদের থেকে তাদের নৈতিকতার ভিত্তি অনেক উন্নত ; কারণ — তারা লড়াই করছে নিজের দেশ রক্ষা করতে, আর

ছয়ের পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন

পাঁচের পাতার পর

হিটলারের বাহিনী এসেছে এক স্বৈরাচারীর বিশ্বসাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন রূপায়িত করতে।''

সোভিয়েট প্রতিরোধে বিশ্বের সমর বিশেষজ্ঞরাও বিস্মিত

সোভিয়েটের বারংবার মৈত্রী-চুক্তির আবেদনে যে ব্রিটেন বছরের পর বছর সাড়া দেয়নি, যুদ্ধের চতুর্থ সপ্তাহে সোভিয়েট-প্রতিরোধের চেহারা দেখে সেই ব্রিটেন তখন সোভিয়েটের সংগে মৈত্রীচুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

আনা লুই স্ট্রং তাঁর 'স্ট্যালিন যুগ' গ্রন্থে লেখেন, ''ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের উপর তাঁর ১৯৫৬ সালের আক্রমণে বলেছেন যে, জার্মানদের অতর্কিত আক্রমণ স্ট্যালিনকে বিস্মিত করেছিল, তিনি সেজন্য ঠিকমত সমরায়োজন করেননি। ... কিন্তু দুনিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞরা এই মত পোষণ করেননি। তাঁরা বরং সোভিয়েটের প্রতিরোধ-সংগ্রাম ও তার সমর-সজ্জা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। ১৯৪১-এর ২৯ জুলাই নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় জর্জ ফিল্ডিং এলিয়ট লেখেন, 'জার্মানদের এই প্রথম এমন একটা বাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়েছে যা ১৯১৮ সালের যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত হয়নি, শিক্ষিত হয়েছে ১৯৪১-এর যুদ্ধের জন্য।' ১১ আগস্ট ম্যাক্স ওয়ার্নার 'নিউ রিপাবলিক' পত্রে লেখেন, 'এ বাহিনী হচ্ছে গঠনে আধুনিক, রণকৌশলে দক্ষ, রণনীতিতে বাস্তবপন্থী'।'' লড়াই কিছুকাল চলার পর সামরিক পর্যবেক্ষকরা ঘোষণা করেন যে, হিটলার যে যুদ্ধ-কৌশলের উপর নির্ভর করতেন, রুশরা সেই 'ঝটিকা আক্রমণে'র সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। জার্মানদের কৌশল ছিল, ট্যাঙ্ক আর বিমানের প্রচণ্ড আঘাতে শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া, পিছু পিছু রণাঙ্গনের অসামরিক 'নরম' পশ্চাদ্‌ভাগে সাঁজোয়া সৈন্যদের অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে রণাঙ্গনস্থিত শত্রুপক্ষ পশ্চাদভূমি থেকে কোনরকম সাহায্য না পায়। জার্মানরা যে দেশেই এ কায়দা অবলম্বন করেছিল, সে দেশই তারা অতি দ্রুত জিতে নিয়েছিল। আনা লুই স্ট্রং লিখছেন, ''বার্লিনে থাকতে একজন মার্কিন সংবাদদাতা আমাকে বলেছিলেন, 'রক্তমাংসের মানুষ এ আক্রমণ সহ্য করতে পারে না।' রুশরা জার্মানদের এ কৌশল ব্যর্থ করে দিচ্ছে দু'টি উপায়ে — এবং দু'টি ক্ষেত্রেই সৈন্যদের দৃঢ় মনোবলের দরকার। জার্মান ট্যাঙ্কগুলো ব্যূহ ভেদ করা মাত্র রুশরা আবার তাদের ব্যূহ এমনভাবে ঠিক করে নিচ্ছে যার ফলে জার্মান ট্যাঙ্কচালকদের থেকে তাদের সাহায্যকারী পদাতিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা ঘটে তার মধ্যে জার্মান ও রুশ — দু পক্ষই সব দিকে লড়তে থাকে। রুশরা স্থানীয় লোকেদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারে। জার্মানরা রাশিয়ায় কোন 'নরম বেসামরিক পশ্চাদভাগ' পায়নি। তারা পাচ্ছে যৌথ-খামারের চাষীদের, যারা গেরিলা-সৈন্যদলে সংঘবদ্ধ হয়ে লালফৌজের সংগে সুশৃঙ্খল সহযোগিতা করে যেত। ... হিটলারকে এই প্রথম একটা সমগ্র জাতির সংগে লড়াই করতে হচ্ছে। ... সোভিয়েটের রণধ্বনি ঃ 'যেখানে কামান গর্জাচ্ছে সেখানেই শুধু আমাদের রণাঙ্গন নয় ; আমাদের রণাঙ্গন হচ্ছে প্রত্যেকটি কারখানায়, প্রত্যেকটি খামারে।''

যুদ্ধ শুরুর ৬ সপ্তাহ পর

যুদ্ধের ৬ সপ্তাহ পর দেখা গেল, জার্মানির তড়িৎগতি বিজয়-অভিযানের পরিকল্পনা মুখ থুবড়ে পড়েছে। হিটলারের লক্ষ্য ছিল, বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত সোভিয়েটকে দখল করা ; বাস্তবে, সাময়িকভাবে সামরিক অগ্রগতিও তারা অর্জন করে। সোভিয়েটের বিশাল অঞ্চল অধিকারও করে। কিন্তু সেজন্য বহু মূল্য তাদের দিতে হয়েছে। তাদের পরিকল্পনা ছিল কিয়েভ ও স্মোলনস্ক এক সপ্তাহের মধ্যে দখল করা ; সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তাদের পরিকল্পনা ছিল এক মাসের মধ্যে মস্কো ও লেনিনগ্রাদের পতন ঘটানো ; সেই পরিকল্পনাও তারা কার্যকরী করতে পারে নি। তারা তখন আটকে আছে স্মোলেনস্ক-এরও আগে, অর্থাৎ লেনিনগ্রাদ থেকে ১০০ মাইল দূরে এবং কিয়েভ থেকে ৮০ মাইল দূরে। পোল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া এবং ক্রীট দখলে তারা যত দ্রুত সাফল্য পেয়েছিল সোভিয়েটে কিন্তু তাদের সেই সাফল্য এল না। হিটলারকে বাধ্য হয়ে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চালাতে হয়। জার্মান অর্থনীতির পক্ষে তার ভার সহ্য করা সহজ হয়নি। নাৎসি বাহিনীর 'অপরাজেয়তা'র তত্ত্ব একটা বিরাট ধাক্কা খেল। অগ্রাভিযানের এই ব্যর্থতা ঢাকতে নাৎসি রেডিও-কে বলতে হয়, জার্মানবাহিনীকে লড়তে হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রে শ্রেষ্ঠ এক শত্রুর বিরুদ্ধে। সোভিয়েট প্রতিরক্ষাবিভাগ অনুসৃত অদ্ভুত কৌশলের ফলে জার্মান হাইকমান্ডকেও তাদের রণকৌশল বদলাতে হচ্ছে।

আনা লুই স্ট্রং তাঁর 'স্ট্যালিন যুগ' গ্রন্থে লেখেন, ''আনে উ'হেয়ার ম্যাক্করমিক 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'-এ লিখলেন, 'রাশিয়ার ছ'সপ্তাহের প্রতিরোধ দেখে লন্ডন, ওয়াশিংটন এবং পরদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত ইউরোপীয় সরকারদের মত বদলে গেছে।' তা দেখে 'কারারুদ্ধ ইউরোপে'রও মত বদলে যায়। ইউরোপে গুপ্ত প্রতিরোধের আন্দোলন দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে।'' (ক্রমশ)

আদবানির পাকিস্তান সফর

চারের পাতার পর

বদলে আদবানির উপরই যখন কার্যত এন ডি এ জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব এল, তখন এতদিন ধরে গড়ে তোলা তাঁর ''উগ্র হিন্দুত্ববাদী'' ভাবমূর্তি বদল করার অর্থাৎ বাজপেয়ির মতো অসাম্প্রদায়িক মুখোশ পরার জরুরি প্রয়োজন দেখা দিল, না হলে জোট দাঁড়াবেনা। ক্ষমতা পাওয়ার জন্য এই কৌশল বদলের প্রশ্নে আরএসএস নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ অবশ্যই দেখা দেয়। তবে আদবানির পাক সফর বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আরএসএস নেতৃত্বের গরিষ্ঠ অংশ আদবানির পিছনেই রয়েছে — যা প্রমাণ করে যে, সরকারি ক্ষমতার স্বাদ আরএসএসের তথাকথিত ''কঠোর মতাদর্শের'' গোড়া নাড়িয়ে দিয়েছে। এসত্য বিজেপি সরকারে থাকার সময়ই স্পষ্ট হয়েছিল। বিজেপি'র নেতা-মন্ত্রীরা যখন অল্পদিনেই কংগ্রেসের চেয়েও বেশি দুর্নীতির পাঁকে ডুবলেন, আর এস এস নেতৃত্ব তখন সব জেনেও তার ''অনুশাসনের দণ্ড'' কারও উপর নামিয়ে আনেনি।

কিন্তু আবার সরকারি ক্ষমতা পেতে শুধু জোট টিকিয়ে রাখার জন্যই আদবানির ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিলনা। আসলে, সরকারি ক্ষমতায় যেতে হলে, ভারতের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর পূর্ণ মদতও বিজেপি'র চাই। ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী এদেশে দ্বিদলীয় পাল্টাপাল্টি রাজনীতির একটা কাঠামো দাঁড় করাবার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে। কংগ্রেস ও বিজেপি — এই দুই প্রধান ও বিশ্বস্ত দলকে রেখে সেই পরিকল্পনা সার্থক করার একটা সুযোগ সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বুর্জোয়াশ্রেণী পেয়েছে, যেটা নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ থেকেই বুর্জোয়াশ্রেণীও টিকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু, বাবরি মসজিদ ধ্বংস থেকে গুজরাটে গণহত্যা গোটা বিশ্বে ভারতের যে মুসলিম বিদ্বেষী ভাবমূর্তি তৈরি করে দিয়েছে, সেটা বিদেশের বাজারে বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশের বাজারে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অবাধ প্রবেশের ও ব্যবসা করার পথে একটা অন্তরায়, যেটা ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী চায়না। ফলে বিজেপিকে আবার সরকারে বসার বাসনা পূরণ করতে হলে, দ্বিদলীয় পরিষদীয় রাজনীতির বড় শরিক হতে হলে, সাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তির যে ছাপ তার গায়ে লেগে আছে তাকে মুছে ফেলতে হবে। ভোটের হাতিয়ার হিসাবেও ''রামজন্মভূমি আন্দোলন'' আগের মতো কাজে দেবেনা, একথাও বিজেপি নেতারা জানেন। একক গরিষ্ঠতা পেতে হলে এদেশে সংখ্যালঘু ভোট চাই— ভোট রাজনীতির এই হিসাব আদবানি-বাজপেয়িরা ভালই বোঝেন।

ভারত-পাক শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করার যে কৃতিত্ব আদবানি পাকিস্তানে গিয়ে বড় গলায় দাবি করেছেন, সেই শান্তি প্রক্রিয়ার পিছনে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর চাহিদা যেমন আছে, আবার একথাও কোনমতেই ভুলে গেলে চলবেনা যে, প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাপেই হঠাৎ এত তৎপরতা শুরু হয়েছে। ভারত-পাক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই অঞ্চলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে হটিয়ে নিজের উপস্থিতি ও প্রভাব বাড়াতে চায়। এই অবস্থায় ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বিদলীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান বিরোধী দলটি যদি পাকিস্তান বিদ্বেষী মনোভাব ছড়ায় তবে তা ভারত-পাক তথাকথিত শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে মার্কিন পরিকল্পনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। একথাটি বুঝিয়ে দিতে কিছুদিন আগে নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফরের অনুমতি মার্কিন শাসকরা সরাসরি বাতিল করে দেয়, যার বিরুদ্ধে বাইরে বিজেপি যা-ই বলুক না কেন, আসল বার্তাটি বুঝতে সংঘ পরিবার ভুল করেনি। 'উগ্র জাতীয়তাবাদী' রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠতা নতুন তো নয়ই, বরং সেটা যে কত পুরনো ও গভীর, তা বিজেপি সরকারে থাকার সময়ই প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং সরকারি ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য বিজেপি'র তাড়না, ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য — এই তিনের সমন্বয়ই আদবানিকে রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আদবানির নিজস্ব ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা। কোনও বুর্জোয়া দলের নেতার ক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মুক্ত থাকার প্রশ্ন ওঠেনা, আদবানির ক্ষেত্রেও উঠতে পারে না। তাঁর মধ্যেও নেতৃত্বের ও প্রধানমন্ত্রীত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকা স্বাভাবিক। রাম রথযাত্রা, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, মুসলিম বিদ্বেষী বিষ ছড়ানো সবই যে লক্ষ্য পূরণ করার জন্য, সেই সরকারি ক্ষমতা পাওয়ার জন্য বাজপেয়ি যদি 'ধর্মনিরপেক্ষ' সাজতে পারেন, তবে আদবানিই বা পারবেন না কেন?

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, সংঘ পরিবারে এত বিরোধ কেন? প্রথমত, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ব্যক্তি নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব সমস্ত বুর্জোয়া দলে অবস্থাবিশেষে প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষভাবে চিরকালই থাকে, যেটা পুঁজিবাদের সংকট ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে তার প্রতিফলন হিসাবে আজ সমস্ত বুর্জোয়া দলের মধ্যেই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। বিজেপি'ও তার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে বিগত পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় সরকারে থাকাকালীন বিজেপি'র মধ্যে দুর্নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এত তীব্র আকারে মাথাচাড়া দেয় যে, নীতিনিষ্ঠ পার্টি হিসাবে দীর্ঘদিনের সযত্নে লালিত তাদের ছবিটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তিআকাঙ্ক্ষার সাথে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর পিছনে আবার বিশেষ বিশেষ একচেটিয়া বা আঞ্চলিক পুঁজিপতিগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বার্থ ও মদতও কাজ করে। দ্বিতীয় যে সমস্যাটা তাদের সামনে বাস্তবে দেখা দিচ্ছে, তা হচ্ছে, পরিবারের উগ্র, অন্ধ কর্মী-সমর্থকবাহিনী নিয়ে। এতদিন শয়নে-স্বপনে-জাগরণে উগ্র হিন্দুত্বের মাদকরসে চুবিয়ে এবং আচরণে-পোষাকে-অভ্যাসে-শপথ গ্রহণে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের মন্ত্রে দীক্ষিত করে উগ্র মুসলিম বিদ্বেষের যে মানসিক কাঠামো দলের কর্মীদের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে, তাকে রাতারাতি ভেঙে নতুন কাঠামো তৈরি করা খুব কঠিন। অথচ, এই যন্ত্রের মতো গোঁড়া কর্মীবাহিনী ছাড়া দল চলবে না, ভোট করা যাবেনা। অতএব, আরএসএস নেতৃত্বকে গোঁড়া ভাব নিয়ে চলতেই হবে। এই সমস্যাকে সামাল দেওয়াই এখন বিজেপি ও আরএসএস নেতাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা। দেখা যাক, দেশিবিদেশি বুর্জোয়া প্রভুরা এ ব্যাপারে সংঘ পরিবারকে কী পথ দেখায়।

উত্তর ২৪ পরগণা

পেট্রল-ডিজেল ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ, লাঠিচার্জ

পেট্রল-ডিজেলের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষিতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং বিদ্যুতের উপর নতুন করে সারচার্জ বসানোর প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে এস ইউ সি আই যে আন্দোলন গড়ে তুলছে, তারই অঙ্গ হিসাবে ১২ জুলাই দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির আহ্বানে জেলা জুড়ে পথ অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয় হাবড়া, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বসিরহাট ও আমডাঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সকাল ১১টায় পথঅবরোধ শুরু হলে ব্যাপক সংখ্যক স্থানীয় মানুষ আগ্রহ নিয়ে চারপাশে দাঁড়িয়ে পড়েন। কোথাও অবরোধ চলে এক ঘণ্টা, কোথাও দু'ঘণ্টা। হাবড়ায় যশোর রোডের অবরোধে পুলিশবাহিনী অতর্কিতে লাঠিচার্জ শুরু করে। পুলিশের নৃশংস আক্রমণে দশ জন এস ইউ সি আই কর্মী আহত হন এবং কমরেড সুকুমার চক্রবর্তীকে পুলিশ মারতে মারতে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। অন্যান্য জায়গাতেও পুলিশ লাঠিচার্জ করে। আমডাঙ্গায় কমরেডস্ চঞ্চল ঘোষ, বিকাশ দাস, গৌতম বিশ্বাস সহ ৫ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ১৩ জুলাই জেলাজুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়েছে। সিপিএমের আন্দোলন নামক খেলার পরিপ্রেক্ষিতে জেলার মানুষের কাছে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন প্রকৃত আন্দোলনরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

ত্রিপুরায় অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ত্রিপুরার সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরি গত ৪ ফেব্রুয়ারি যখন রাজধানী আগরতলায় ঘটা করে অনলাইন লটারি নামক জুয়ার উদ্বোধন করেন, সেদিনই এই জুয়ার বিরুদ্ধে রাজধানীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল এস ইউ সি আই। ত্রিপুরার মানুষ চাইছিলেন — সরকারি উদ্যোগে জুয়াখেলার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ হোক। সেক্ষেত্রে এস ইউ সি আই-এর এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ত্রিপুরার প্রতিবাদী কণ্ঠকে প্রতিফলিত করেছে। সেকারণে, এই বিক্ষোভকে অভিনন্দন জানিয়ে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ এমনকী সিপিএমের সৎ কর্মীরাও এই জুয়ার বিরোধিতায় এগিয়ে এসেছেন।

সরকার ঘোষণা করেছে, এই জুয়া থেকে সরকারের বছরে আয় হচ্ছে চার কোটি টাকা। কিন্তু কত অসংখ্য মানুষের সর্বনাশের বিনিময়ে সরকারের এই আয় — এই প্রশ্ন জনসাধারণের মধ্যে উঠে যাওয়ায় দীর্ঘ কয়েকমাস ত্রিপুরা রাজ্যে এই লটারি অনুষ্ঠিতই হতে পারেনি; এই খেলা চলত বহির্রাজ্যে। সম্প্রতি আগরতলা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি কাউন্টার খুলে খেলা শুরু হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ১১ জুলাই সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং এ আই ডিএসও-র উদ্যোগে আবার বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। বিকাল ৪টায় বিক্ষোভ মিছিল কর্নেল-চৌমুহনি থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে দুর্গা-চৌমুহনি লটারি কাউন্টারের সামনে গেলেই পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝে অসাধু ব্যবসায়ীরা তৎক্ষণাৎ কাউন্টার বন্ধ করে দেয়। ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড মিঠু দেবনাথ, ডিএসও'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড বাবুল বণিক, এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড শিবানী দাস। বক্তারা এই সর্বনাশা অনলাইন লটারি জুয়ার বিরুদ্ধে ছাত্র-যুব-মহিলা সহ সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষকে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, সিপিএম আজ পুঁজিবাদের সেবায় দক্ষিণপন্থী দলগুলিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

গুজরাটে বন্যাত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এস ইউ সি আই কর্মীরা

প্রবল প্রতিকূলতা পেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট সহ গুজরাটের অন্যান্য বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এস ইউ সি আই কর্মীরা। বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ ও ওষুধ সংগ্রহ করে, খাবারের প্যাকেট তৈরি করে বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছেন। এছাড়া বিপন্ন মানুষকে যথাসাধ্য চিকিৎসার সুযোগ দিতে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহযোগিতায় গুজরাটের বিভিন্ন জায়গায় পাঁচটি চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করছেন তাঁরা।

ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ত্রাণকার্য চালাতে গিয়ে এস ইউ সি আই কর্মীরা লক্ষ্য করেছেন যে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত উদাসীনতা ও অপদার্থতাই রাজ্যের মানুষকে এই ভয়াবহ বন্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ত্রাণকার্যেও কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার এবং রাজ্যের নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত বিজেপি সরকার একইরকম উদাসীনতা ও অকর্মণ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। বহু-বিজ্ঞাপিত 'গুজরাট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি'র ভূমিকাও তথৈবচ। উন্নয়নের নামে চূড়ান্ত অপরিকল্পিত নগরোন্নয়ন, আমেদাবাদ-বরোদার মধ্যে নির্মিত এক্সপ্রেসওয়ের ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা বা সুরেন্দ্রনগর থেকে ভাবনগর পর্যন্ত মিটারগেজ লাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করার কারণে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং তারই ফলে এই বিধ্বংসী বন্যা। পরিস্থিতিকে আরও সঙ্কটপূর্ণ করে তুলেছে গোড়া থেকেই ত্রুটিপূর্ণ নর্মদা পরিকল্পনা। এর বিভিন্ন খালগুলি বহনক্ষমতার অভাবে জল অপসারণের পরিবর্তে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে দিয়েছে। রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন বর্ণিত দেশের 'সর্বাধিক উন্নত' রাজ্য, যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রচারের ঢাক পেটাচ্ছেন এই হল সেই গুজরাট রাজ্যের প্রকৃত চেহারা।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, রাজ্যের এই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে জনসাধারণ যখন নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিপন্ন মানুষদের জীবনরক্ষার চেষ্টা করছেন, তখন আরএসএস, ভিএইচপি কিংবা বিজেপি'র মতো দলগুলি অযোধ্যা এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধ খুঁচিয়ে তুলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

বরোদাতে এস ইউ সি আই রিলিফ ক্যাম্পের সামনে বন্যার্ত মানুষের ভিড়

আই এম ডি টি আইন বাতিল দুরভিসন্ধিমূলক

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি

আসামের আই এম ডি টি আইন, ১৯৮৩ (ইল্লিগ্যাল মাইগ্র্যান্টস্ ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইবুনালস্ অ্যাক্ট) বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট ১২ জুলাই যে রায় দিয়েছে, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী সে প্রসঙ্গে ১৩ জুলাই এক বিবৃতিতে গভীর ক্ষোভ ও আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছেন, এই রায় আসু-এজিপি-বিজেপি-আরএসএস-এর চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণতাবাদী জোটকেই উল্লসিত করেছে, কারণ তারাই আসামে সংখ্যালঘু জনগণকে ধনে-প্রাণে মারতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। কমরেড মুখার্জী বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরিব মানুষ, যাঁরা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষেরই নাগরিক, 'বিদেশি' তক্‌মা লাগিয়ে তাঁদের উপর আরও বেশি হয়রানি, নির্যাতন চালিয়ে দেশ থেকে বিতাড়ন করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত রায় সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণতাবাদী জোটের হাতে শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে কাজ করবে, সেজন্যই এই ন্যক্কারজনক পরিকল্পনাকে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করা দরকার।

কমরেড নীহার মুখার্জী দৃঢ় মত ব্যক্ত করে বলেন — চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বৈধ ভারতীয় নাগরিকদের 'বাংলাদেশি' বলে চিহ্নিত করার যে ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে, আই এম ডি টি অ্যাক্ট ১৯৮৩-র পরিবর্তে 'ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬' চালু করার জন্য দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, সেই আধা ফ্যাসিস্ট অপচেষ্টা বানচাল করার পক্ষে পুরোপুরি অনুপযুক্ত ও অকার্যকরী হতে বাধ্য এবং তা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের নাগরিকত্বকে পূর্ণ সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হবে।

সেই সঙ্গে আসামের বিশেষ পরিস্থিতিতে আই এম ডি টি অ্যাক্টের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি সুপ্রিম কোর্টের সামনে ঠিকমতো তুলে ধরার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা না করে, এ ধরনের অবিবেচনা প্রসূত একটি রায় ঘোষণার কাজটি ইচ্ছাকৃতভাবে সহজ করে দেওয়ার জন্য এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনার চক্রান্তের শরিক হওয়ার জন্য কমরেড মুখার্জী কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত ও সিপিএম-সিপিআই সমর্থিত ইউ পি এ সরকারকে অপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত করেছেন। জুলুম ও নির্যাতনের শিকার আসামের সংখ্যালঘু জনগণের প্রকৃত নাগরিক অধিকার উপযুক্তভাবে সুরক্ষিত রাখার জন্য সংসদে আইন করে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়ার জন্য কমরেড নীহার মুখার্জী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

আসামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বৈধ ভারতীয় নাগরিকদের উপর 'বিদেশি' তক্‌মা এঁটে দেওয়ার হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে; উগ্র জাতীয়তাবাদী ও চরম সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে তাদের নির্যাতনের অবিলম্বে অবসানের উদ্দেশ্যে এবং প্রকৃত ভারতীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের বৈধ নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করার যে ব্যবস্থাগুলি আই এম ডি টি অ্যাক্ট ১৯৮৩-তে ছিল সেগুলি বজায় রেখে অবিলম্বে একটি উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দাবিতে দেশব্যাপী শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কমরেড নীহার মুখার্জী দেশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ছাত্র-অভিভাবকদের আন্দোলনে সমাজবিরোধীদের আক্রমণ

কুলতলী থানার জালাবেড়ে অঞ্চলের কাওরা খালি নকুল সহদেব হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-অভিভাবক-দের উপর গত ৬ জুলাই সিপিএম আশ্রিত গুণ্ডারা নৃশংস আক্রমণ চালায়। ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ও একজন অভিভাবক আহত হন। ঐ অভিভাবক সহ ৩ জন ছাত্রকে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

সম্প্রতি নতুন ম্যানেজিং কমিটি আসার পর তাদের হাতে স্কুল উন্নয়নের জন্য জেলা পরিষদের মঞ্জুর করা ৩ লাখ টাকা সহ স্কুল ফান্ডের টাকা খরচের অধিকার দেওয়ার জন্য স্থানীয় সিপিএম-এর একাংশ প্রধান শিক্ষককে চাপ দিতে থাকে। তিনি রাজি না হলে সমাজবিরোধীদের দিয়ে ভয় দেখিয়ে জোর করে পদত্যাগপত্র লিখে দিতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। এরপর ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে সিপিএম-এর স্থানীয় বহু সাধারণ সমর্থকসহ বহু ছাত্র ও অভিভাবক গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি ম্যানেজিং কমিটি এবং ডি আই দপ্তরে জমা দেন। কিন্তু কোনও সমাধান না হওয়ায় ৬ জুলাই ছাত্র-অভিভাবকরা ম্যানেজিং কমিটিকে ডেপুটেশন দিতে গেলে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি স্থানীয় সিপিএম নেতা বাক্কার সর্দারের নেতৃত্বে সমাজবিরোধীরা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধর শুরু করে। এই ঘটনায় এলাকায় প্রবল গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। এ আই ডি এস ও ৯ জুলাই কুলতলী বিধানসভা কেন্দ্রে ছাত্র ধর্মঘট ডাকে, শিক্ষক সংগঠন এস টি ই এ'র পক্ষ থেকেও ম্যানেজিং কমিটির কাছে প্রধান শিক্ষকের পুনর্বহালের দাবি জানানো হয়, এই মর্মে বিডিও'র কাছেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। ৯ জুলাই সফল ছাত্র ধর্মঘটের পর একই দাবিতে ১৮ জুলাই জামতলায় বিশাল ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জয়নগরে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির দাবি আদায়

সম্প্রতি জয়নগর ২নং ব্লক এলাকায় বিভিন্ন গ্রামের মানুষ জলবাহিত পেটের রোগে আক্রান্ত হয়। নিমপীঠ হাসপাতালে বহু রোগী ভর্তি হয় এবং ২ জন শিশু মারা যায়। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ৪ জনের এক প্রতিনিধি দল গত ৪ জুলাই ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসার দাবি করে। বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সর্দার-পাড়ায় ২৫/৩০টি পরিবারের প্রায় ৬০/৭০ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় রয়েছে — এই সংবাদ পাওয়ামাত্র ৫ জুলাই হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির জেলা সম্পাদক ডাঃ হান্নান হালদারের নেতৃত্বে ডাঃ আবু বাক্কার লস্কর (প্রাক্তন বি এম ও এইচ), ডাঃ তপন বৈদ্য ও সহকারী আশীষ রায় সহ ৪ জনের চিকিৎসক দল ঐ এলাকায় যান এবং সাধ্যমতো ওষুধ ও পরিষেবা দেন। অপরদিকে, ঐ এলাকায় স্থায়ী চিকিৎসা শিবির স্থাপন, সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ ও অবিলম্বে পানীয় জল সরবরাহের দাবি নিয়ে কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজা হালদার সহ স্থানীয় মানুষরা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। প্রতিনিধি দল ঐ স্মারকলিপির এক কপি বিডিও-কে দেন এবং এই রোগের ব্যাপকতার কথা এবং শিশুমৃত্যুর ঘটনা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়। বিভিন্ন দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করার পর ৬ জুলাই সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এলাকা পরিদর্শনে যান এবং ঐদিন থেকে প্রতিদিন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের দায়িত্বে সরকারি চিকিৎসক দল যাচ্ছেন। রোগ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ডেপুটেশনের পরে বিডিও জরুরি ভিত্তিতে ঐ এলাকায় টিউবওয়েল বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

মেদিনীপুরে হাজার হাজার মানুষের আইন অমান্য

এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা কমিটির ডাকে ১৩ জুলাই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সুদূর বিনপুর থেকে মোহনপুর, গড়বেতা থেকে ঘাটাল — সমস্ত ব্লকের হাজার হাজার মানুষ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরের সামনে আইনঅমান্য করে কারাবরণ করেন।

নয়া পঞ্চায়েত কর বাতিল, সকল গরিবদের বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, পেট্রল ডিজেলের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার, পুনর্বাসন না দিয়ে হকার উচ্ছেদ বন্ধ করা, বন্যা-খরা নিয়ন্ত্রণ করে জলসেচের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুতের বর্ধিত চার্জ তুলে নেওয়া, বনাঞ্চল ও কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপনের দ্বারা বেকারদের কাজ দেওয়া ইত্যাদি জেলার সার্বিক উন্নয়নের ১৮ দফা দাবিতে তাঁরা প্রথমে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে এক সভায় সমবেত হন। সেখানে দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান বলেন, আজকের সমাবেশ প্রমাণ করছে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে হাজারে হাজারে মানুষ গ্রাম শহরে মাথা তুলছে। তিনি গণকমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সভাশেষে বিশাল মিছিল আইন অমান্যে এগোলে পুলিশ বিনা প্ররোচনায় লাঠি চালালে ৪৭ জন আহত হন এবং ৩৫০ জন মহিলা সহ ৫৫২৩ জন আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

আই এল ও'র ৯৩তম সম্মেলনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

সদস্য দেশগুলিই আই এল ও'র সুপারিশ লঙঘন করছে

গত ৩১ মে থেকে ১৬ জুন সুইজারল্যান্ডের জেনিভায় ইন্টারন্যাশানাল লেবার অর্গানাইজেশন বা আই এল ও'র ৯৩তম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, বি এম এস, ইনটাক, সিটু, এইচ এম এস, এবং এ আই টি ইউ সি এই সম্মেলনে যোগ দেয়।

সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আই এল ও হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক ত্রিপাক্ষিক সংগঠন। এবারের অধিবেশনে সর্বমোট ১৭০টি দেশ যোগ দেয়। সম্মেলনে এবার যেসব বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল — আই এল ও নির্ধারিত শ্রমিকদের অধিকারগুলোর বাস্তব অবস্থা। এছাড়া স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, নবীন প্রজন্মের সামনে জীবিকার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে একাধিক কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা শ্রমিক প্রতিনিধিদলের একজন প্রবীণ সদস্য হিসাবে শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিশনে বক্তব্য রাখেন। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল, আই এল ও'র কনভেনশন ও সুপারিশ অনুযায়ী শ্রমিকদের যেসব অধিকার থাকার কথা, সদস্য দেশগুলিতে তা কী পরিমাণে লঙিঘত হচ্ছে তা দেখা এবং তার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করা। প্লেনারি অধিবেশনে তিনি দুটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত উপস্থিত করেন। একটি বিষয় ছিল ''বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জোট'' (গ্লোবাল অ্যালায়েন্স এগেন্স্ট ফোর্সড লেবার) ও ''মূল কনভেনশনগুলির লঙঘন''। ''বাধ্যতামূলক শ্রম'' বিষয়ে আই এল ও'র পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, তাকে স্বাগত জানিয়েই কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতাই হচ্ছে, শোষণমূলক বিশ্বায়নের সবচেয়ে গুরুতর শিকার শ্রমিকরা — তা যে দেশেরই হোক না কেন। আই এল ও'র মূল ধারাগুলি এবং এ সংক্রান্ত ন্যূনতম মান সকল দেশেই লঙঘন করা হচ্ছে যার সামান্য কিছু প্রকাশ পায়। আই এল ও'র নজরদারি ব্যবস্থার আওতায় আসে আরও কমসংখ্যক ঘটনা। কমিটির রিপোর্ট এ বিষয়ে একটা বিশাল কাজ করেছে — যার দ্বারা এ সত্য প্রকাশ পেয়েছে যে, বিশ্বের সমস্ত দেশেই এই লজ্জাজনক অপরাধটি ঘটছে।

তিনি বলেন, আজকের যুগে বাধ্যতামূলক শ্রমের যে সমস্যা, তা সামন্তী যুগের সমস্যা থেকে প্রকৃতিগতভাবেই আলাদা এবং আজকের সমস্যার উৎস আজকের পুঁজিবাদী সমাজের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত। শোষণমূলক বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্বজুড়ে এই সমস্যা স্বভাবতই ক্রমবর্ধমান। এই ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম আই এল ও-র সংবিধান অনুযায়ী এবং বাস্তবেও মানবাধিকারের চূড়ান্ত অবমাননার মধ্যেই পড়ে। তিনি আরও বলেন, আই এল ও'র রিপোর্ট অনুযায়ীই এর মূল কারণ হল তীব্র দারিদ্র্য ও চূড়ান্ত অসাম্য। এছাড়াও কাজ করিয়ে পয়সা না দেওয়া, শ্রমিকদের সাথে অমানবিক ব্যবহার করা, মাসের পর মাস শ্রমিকদের বন্দি করে রাখা, যৌন অত্যাচার এবং নানারকমের দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারের যে ভয়াবহ চিত্র এই রিপোর্টে ফুটে উঠেছে তা এই সমস্যার গভীরতাকে বুঝিয়ে দেয়। এই বাধ্যতামূলক শ্রমের সমস্যা আজ নানা পণ্যের উৎপাদনের সাথেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে। তিনি আরও দেখান যে, রিপোর্ট অনুযায়ী আই এল ও'র বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রও সরকারিভাবেই আজ ক্রমবর্ধমান হারে বাধ্যতামূলক শ্রমের নীতিকেই নিয়োগ করছে। এই ঘটনা আই এল ও'র নিয়মকানুনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করারই একটি দৃষ্টান্ত। বেসরকারীকরণ, উদারীকরণের নামে যা চলছে, তার ফলে শ্রমিকরা তাঁদের স্থায়ী কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, দাবি-দাওয়া নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অধিকার শ্রমিকরা হারাচ্ছেন এবং অনেক কম পারিশ্রমিকে চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের সামনে চাকরির সুযোগ ক্রমাগত কমছে এবং দীর্ঘ লড়াই-এর মধ্য দিয়ে যেসব সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার তাঁরা অর্জন করেছিলেন, তাও অপহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বহু সদস্য দেশে আজ বিচারবিভাগও শ্রমিকবিরোধী মনোভাব নিয়ে চলছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একটি সমীক্ষার তথ্যে দেখা গিয়েছে যে, কারিগরি ক্ষেত্রের যে বিপুল বিকাশ ইতিমধ্যেই বিশ্বে ঘটেছে, তাতে পুঁজিবাদী মুনাফালালসা থেকে মুক্ত একটি ব্যবস্থায় বিশ্বের কর্মক্ষম সকল মানুষকে যদি দিনে দুই থেকে চার ঘন্টা কাজ দেওয়া যায় তাহলেই এমন যথেষ্ট সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব, যা দিয়ে সমগ্র মানবজাতির খাদ্য, আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানীয় জল, নিকাশী সংক্রান্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, চিকিৎসা ও বার্ধক্যে পেনশন প্রভৃতির প্রয়োজন মেটানো যায়। ফলে, মূল সমস্যাটা শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে যুক্ত, যাকে উচ্ছেদ করতে না পারলে শ্রমিকদের উপর অন্যায়-অবিচার-শোষণের অবসান ঘটানো যাবে না। এমনকী এই ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের সামান্য রিলিফও যদি দিতে হয়, তবে সেটা কেবল আই এল ও'র সদিচ্ছা ও পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়। সেজন্য বাধ্যতামূলক শ্রম নিবারণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা ও তা প্রয়োগ করার উপরই জোর দিতে হবে।

পূর্বশর্ত ছাড়াই সিপিআই (মাওবাদী)-র সাথে সরকারকে আলোচনায় বসতে হবে

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, ''মহান মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি, ভারতবর্ষের বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি প্রশ্নে সিপিআই (মাওবাদী)-র সাথে আমাদের দলের মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা মনে করি, তাঁরা একটি সংগ্রামী বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তি, তাঁদের উত্থাপিত দাবি গণতান্ত্রিক এবং তাঁরা যখন বর্তমানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আসতে আগ্রহী তখন কোনও অজুহাতে তাঁদের এই অধিকার বন্ধ করা চলে না। সিপিএম নেতৃত্বাধীন সরকার প্রথম থেকেই বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের পথে না গিয়ে প্রতিহিংসামূলক দমন-নিপীড়ন চালিয়ে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।

সিপিআই (মাওবাদী) গোষ্ঠী প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছে যে তারা পুলিশের চর গণ্য করে তিনজন সিপিএম কর্মীকে হত্যা করেছে। তার উত্তরে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক দাবি করেছেন, তাঁদের কর্মীরা পুলিশের চরবৃত্তি করে না। আমরা সিপিআই (মাওবাদী) কর্তৃক এই ধরনের হত্যার রাজনীতিকে সমর্থন করি না ; সাথে সাথে একথাও বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আজ সর্বস্তরে পুলিশ-প্রশাসনকে সিপিএম দলের নেতা কর্মীরাই নিয়ন্ত্রণ করছে।

খুনের রাজনীতি বন্ধ না করলে সিপিআই (মাওবাদী)-র সাথে বৈঠক করা চলে না বলে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অজুহাত দিয়েছেন; স্বীকার না করলেও তিনি কিন্তু এটা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক রাজনৈতিক খুন তাঁদের দলের দ্বারাই সংগঠিত হচ্ছে ও হয়েছে। ফলে তাঁর এই পূর্বশর্ত দেওয়ার কোন নৈতিক অধিকার নেই।

আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করছি ঃ-

১। কোনরকম পূর্বশর্ত ছাড়াই সিপিআই (মাওবাদী)-র সাথে আলোচনায় বসতে হবে।

২। তাদের উপর পুলিশি দমন-নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।

৩। তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের অধিকার বন্ধ করা চলবে না।

কোচবিহার

গণআন্দোলনে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল এবং সভা

তুফানগঞ্জে পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে এসেছিল ছাত্র, যুবক, মহিলা, ভ্যানচালক, শিক্ষক, হকার ও রিক্সাচালক সহ সর্বস্তরের মানুষ ৭ জুলাইয়ের মিছিলে।

গত ৪ জুলাই পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তুফানগঞ্জের এসডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভরত এস ইউ সি আই দলের কর্মীদের উপর থানার ওসি'র নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশবাহিনী বেপরোয়া আক্রমণ চালায়, এমনকী মহিলা কর্মীরাও তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। এই পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদেই ছিল ৭ জুলাই-এর ধিক্কার সভা ও মিছিল। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মিছিল পৌঁছায় তুফানগঞ্জ কমিউনিটি হলের সামনে। সেখানে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন তুফানগঞ্জ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন। বক্তব্য রাখেন ডিএসও'র জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল রায়, গণআন্দোলনের নেতা কমরেড আছরউদ্দিন আহমেদ, এস ইউ সি আই তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সান্ত্বনা দত্ত। বক্তারা প্রত্যেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, যেভাবে গণআন্দোলনের মহিলা কর্মীদের উপর অশালীন আক্রমণ করা হয়েছে তার নিন্দার ভাষা নেই। মারাত্মকভাবে আহত কর্মীদের বিনা চিকিৎসায় প্রায় ছ'ঘন্টা ফেলে রাখা হয়েছে থানায়। বার বার বলা সত্ত্বেও প্রাথমিক চিকিৎসাটুকুও করা হয়নি।

বক্তারা বলেন, নির্যাতন সহ্য করেও সত্যের ঝাণ্ডা তুলে ধরতে হয় — এইখানেই মনুষ্যত্ব, এখানেই গৌরব। সভ্যতার ইতিহাসও সেই কথা বলে। এই চিন্তাকে নিয়েই এগিয়ে চলেছে এস ইউ সি আই দল। ফলে এই দলটিকে শক্তিশালী করার মধ্যেই রয়েছে গরিব মানুষের বাঁচার গ্যারান্টি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in